কঠিন মায়া

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

প্রাপ্তিস্থান

মিত্র ও ঘোষ

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ
২ শ্রাবণ ১৩৬৭

—সাড়ে চার টাকা—

প্রচ্ছদপট :
অঙ্কন—শ্রীঅজিত গুপ্ত
মুদ্রণ—ফোটোটাইপ সিণ্ডিকেট

এম. চক্রবর্তী কর্তৃক পি ১৯ বেণী ব্যানার্জী এভিনিউ কলিকাতা-৩১ হইতে প্রকাশিত ও
ক্যাশ প্রেস ৩৩বি মদন মিত্র লেন কলিকাতা-৬ প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

শ্রীধ্যানেন্দ্রকুমার মিত্র

শ্রীচরণেষু

'কঠিন মায়া' নামে আমার একটি ছোট গল্প ছিল। সেটি আমার 'রজনীগন্ধা' বইতে আজও আছে। কোন চলচ্চিত্র-প্রতিষ্ঠান গল্পটি চিত্রে রূপায়িত করতে চাওয়ায়, গল্পটি বাড়িয়ে উপন্যাসের আকারে দাঁড় করাতে হয়েছে। এই বইটি সেই প্রচেষ্টারই ফল। মূল কাহিনীর অনেকখানিই যে এতে অদল-বদল হয়েছে—তা বলাই বাহুল্য। আমার অন্য দু-একটি কাহিনীরও আখ্যানাংশ 'ধ্যে যোগ হয়েছে। সুতরাং এটিকে স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে প্রকাশ করায় কোন দোষ '’লে মনে করি না। তবে এর রচনাটা প্রধানতঃ চলচ্চিত্রের প্রয়োজনেই -পাঠকরা সে কথাটা স্মরণ রাখলে বাধিত হবো। ইতি—

এম. চ

ক্যাশ

লেখক

কঠিন মায়া

॥ ১ ॥

সর্বেশ্বর কলকাতায় এক মেসে থাকে। কখনও কদাচিৎ দেশে যায়। দেশে ওর থাকার মধ্যে আছেন এক পিসিমা। জমি-জায়গা যা আছে তা থেকেই তাঁর সম্বচ্ছরের চালটা হয়ে যায়, কোন কোন বছর বরং কিছু ধান বেচে দু'চারটে টাকাও হাতে আসে। সুতরাং সর্বেশ্বরের কোন দায় নেই, বছরে খান-চারেক পোস্টকার্ড আর মাঝে মাঝে দু-পাঁচটা টাকা পাঠিয়েই সে খালাস।

কিন্তু দায় না থাকলেও টান একটা ছিল। বাবা-মাকে কখনও দেখে নি সে—দেখলেও সে কথা বিশেষ মনে পড়ে না। জন্মে পর্যন্ত আত্মীয় বলতে, অভিভাবক বলতে সে এই পিসিমাকেই দেখেছে, তাই হঠাৎ টেলিগ্রামখানা পেয়ে সে একটু ব্যস্তই হয়ে পড়ল। টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন কে একজন বনমালী ঘোষাল—লেখা আছে "তোমার পিসিমা মৃত্যু-শয্যায়—শিগ্‌গীর এসো।" বনমালী ঘোষাল কে তার ঠিক মনে পড়ল না। পাড়ারই লোক হয়ত, দেখলে মনে পড়বে। সেটা বড় কথা নয়—পিসিমার অসুখ সেইটেই বড় কথা। তিনি ভাল আছেন জেনেই সে নিশ্চিন্ত থাকে। এতটা উদাসীনও থাকতে পারে দেশ সম্বন্ধে। আজ এই টেলিগ্রামখানা পেয়ে সে নতুন ক'রে বুঝল যে তার সমস্ত নিশ্চিন্ততা ও নির্ভরতার মূলে এই আছেন এই পিসিমাই। পিসিমা না-থাকা মানে যে কি, ভাবতেই তার মাথা ঝিমঝিম ক'রে উঠল।

অতএব সে প্রায় পত্রপাঠ-মাত্রই প্রস্তুত হ'ল। কিছু টাকা যোগাড় ক'রে নিয়ে পিসিমার জন্যে কিছু ফল ও একশিশি হর্লিকস্ কিনে পরের দিনই সে ভোরের ট্রেনে চেপে বসল এবং বেলা ন-টার মধ্যেই দেশের বাড়িতে এসে উপস্থিত হ'ল।

কিন্তু ওদিকে যত দ্রুতই এসে থাক্—বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়াতে হয় ওকে। বন্ধুমহলে সে যতই যা জারিজুরি করুক, আসলে সেও সাধারণ দুর্বল মানুষই। কী খবর শুনবে বা কী দৃশ্য দেখবে—এই ভেবে যেন পা ওঠে না। বুড়ী বেঁচে আছে তো? ডাকতে গিয়ে যেন গলা কেঁপে যায়। তবু প্রাণপণে গলায় জোর দিয়ে ডাকে—'পিসিমা।'

ডেকেও কান পেতে রইল—তেমন অসুখ হলে প্রতিবেশীরা কেউ না কেউ থাকবেই। কিন্তু কৈ, তাদের কারও গলা শোনা যাচ্ছে না তো। কোন সাড়াই নেই কোথাও। আর একটু ইতস্ততঃ ক'রে বাগানের আগড়টা ঠেলে ঢুকে পড়ল; খানিকটা ভেতরে এসে আবার হাঁক দিল, 'পিসিমা।'

এবার ভেতর থেকে সাড়া এল—'কে রে, সবু এলি? আয় আয়।'

সর্বেশ্বর আশ্বস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি সদর দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। কিন্তু এ কি! পিসিমা তো শুয়ে নেই। দিব্যি রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে কাঠের উনুনে পাতা জ্বেলে কি যেন রান্না করছেন। এই মানুষের অসুখ শুনে সাত দেশ দূর থেকে ছুটে দেখতে এল সে? সে কতকটা অবাক হয়েই দাঁড়িয়ে গেল।

'আয় রে, অমন দাঁড়িয়ে রইলি কেন? ভেতরে আয়।' নিবন্ত উনুনে ফুঁ পাড়তে পাড়তে বলেন পিসিমা।

তার পর চোখ তুলে চেয়ে বলেন, 'ইস! কী ছিরির চেহারা ক'রে এসেছিস বল তো! চিরদিন কি তোর সমান গেল? ঐ-জন্যেই তো এবার উঠে পড়ে লেগেছি। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর না হ'লে তোমার চলবে না।'

বাস্তবিক সর্বেশ্বরের চেহারাটা দেখবার মতোই। যেমন রুক্ষ তেমনি শ্রীহীন, লম্বা একহারা চেহারা, কতদিন দেহে তেল-জল

পড়েনি তা অনুমান করাও কঠিন। মাথার চুলগুলো ধুলোয় বিবর্ণ। গায়ে একটি ময়লা কোট,—সে কোট হয়ত এককালে সাদাই ছিল, এখন ধুলো ময়লা এবং নানাবিধ দাগে তা এক বিচিত্রবর্ণ ধারণ করেছে। হাতে এক টোল-খাওয়া পুরনো স্যুটকেশ আর এক হাতে একটা থলিতে পিসির জন্যে ফলমূল। সর্বেশ্বর অবাক হয়ে খানিকটা চেয়ে থেকে বললে,—'তবে যে শুনলুম তোমার মরণাপন্ন অসুখ! কে এক বেটা বনমালী ঘোষাল তার পাঠিয়েছে—'

বাধা দিয়ে পিসিমা ব'লে উঠলেন,—'ওমা, ও কী কথার ছিরি রে! সে তোর গুরুজন যে। তার তো বেয়াইকে আমিই করতে বলেছি। জানি যে এধারে যত চাল্লি-বেচাল্লিই করুক, আমার অসুখ শুনলে সবু ঠিক ছুটে আসবে। আয় আয়, বোস—'

পিসিমা দাওয়ার ওপরই একটা পিঁড়ি এগিয়ে দিলেন।

স্যুটকেশের গায়ে থলিটা ঠেস দিয়ে রেখে সর্বেশ্বর পিঁড়িটা টেনে নিতে নিতে বললে,—'তা তো হ'ল কিন্তু বেয়াইটি আবার কোথা থেকে গজালো? আর তুমিই বা তাকে তার করতে বললে কেন?'

'নইলে তুই যে আসতিস না বাবা!' একগাল হেসে পিসিমা বলেন, 'তোকে তো আমি চিনি।'

'তা আমাকে আনাবার কি এমন জরুরী দরকারই বা পড়লো?'

'তোর যে বে'র ঠিক করেছি রে! ঐ বনমালী ঘোষালের মেয়ের সঙ্গেই।...বনমালীকে তোর মনে নেই? আমার ভাসুরপোর আপনার পিসৃশ্বশুর। সেই তোর পৈতের সময় এসেছিল এখানে? ওর মেয়েও এসেছিল নাকি, তুইও দেখে থাকবি।...বেশ মেয়েটি। আমার অবশ্য তেমন মনে নেই—তবে এবার নিজে গিয়ে দেখে এসেছি! মেয়ে ভাল, বংশও জানা-শুনো—মিছিমিছি দেরি ক'রে লাভ কি? সামনের তরশুই বিয়ে ঠিক ক'রে ফেলেছি—আজ পাকা দেখা। সব ব্যবস্থা কম্‌প্লিট্‌।'

একগাল হাসলেন পিসিমা। ইংরিজী বলতে পারার আনন্দেই বোধ হয়।

'তা—তার মানে?' হতভম্বের মতো প্রশ্ন করে সর্বেশ্বর, 'তার মানে কি?'

'মানে আবার কি? বিয়ে। বিয়ের কথা শুনিস নি কখনও? না, মানুষের বয়েস হ'লে বে হয় তা জানিস না?……ঐ যা, উনুনটা বুঝি আবার নিভে গেল।' পিসিমা ব্যস্ত হয়ে ফুঁ পাড়তে থাকেন উনুনে।

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল পিসিমা!' এবার সর্বেশ্বর উঠে দাঁড়ায়।

'কেন বাবা, মাথা খারাপ হবার কি আছে?' দস্তুরমতো ঝেঁঝে ওঠেন পিসিমা, 'তোমার কি বিয়ের বয়স হয় নি—এখনও কি কচি খোকাটি আছ?'

'কচি খোকাটি নেই বলেই তো বলছি পিসিমা! বয়সের কি গাছ-পাথর আছে নাকি? এখন আর বিয়ে করা সাজে না আমার।'

'আচ্ছা আচ্ছা, ঢের হয়েছে। আজকাল তুকুড়ি বয়েস পেরিয়ে গিয়ে কত লোকে বে করছে। তোর তো এই ষেটের চৌত্রিশ হ'ল। তা ছাড়া, সে আমরা বুঝব। আমি বুঝব—মেয়ের বাবা বুঝবে। তোর কি? আমরা কি মরে গেছি—না তুই-ই আউট হয়ে গেছিস?'

সর্বেশ্বর এবার ব্যাকুল হয়ে ওঠে একেবারে—'কি বলছ পিসিমা। এই তো আমার অবস্থা, অন্তভক্ষো ধনুর্গুণো, না চাল না চুলো—নিজেই খেতে পাই না অদ্দেক দিন—বৌ-ছেলে পুষবো কি?'

'তোমার ঐ সব বড় বড় বাক্যিতে ভুলেই তো এতদিন চুপ ক'রে ছিলুম বাছা, আর আমি ভুলছি নে। বৌ আমার কাছে থাকবে—

আমি তাকে খেতে দেবো। একটা পেট, তার জন্যে কত খরচ বাড়বে শুনি? আমার যা আছে তাতে একটা বৌ পুষতে পারব না?'

'কিন্তু তার পর?'

'তারপর তুমি রোজগার করবে। তুমি ইচ্ছে করলেই চাকরি করতে পারতে বাছা। এখনও কি আর জুটিয়ে নিতে পারো না? না হয় অন্য কোন কাজেই রোজগার করবে। পুরুষ মানুষ—মুটেগিরিতেও পয়সা। সেজন্যে আমি ভাবি না। ঘাড়ে চাপ পড়লে পথও ঠিক খুঁজে পাবে।'

সর্বেশ্বর অসহায় ভাবে এদিক ওদিক তাকায়। আকুল হয়ে বলে—'তুমি বুঝতে পারছ না পিসিমা। দোহাই তোমার—'

'খুব বুঝেছি, ঢের বুঝেছি। আমি আর তোমার কোন কথা শুনতে চাই না। তোমার ও ভোচ্‌কানিতে আর ভুলছিনি। এতদিন জোর ক'রে দেওয়া উচিত ছিল—না দিয়ে আহাম্মুকি করেছি।'

'পিসিমা লক্ষ্মীটি—কথা শোন। আর যা করতে বলবে করবো। ঊটি পারব না।'

'ছ্যাখ্‌ সবু! আমি সে ভদ্দরলোকদের কথা দিয়েছি। এখন যদি তুমি গোলমাল করো তো তোমার সামনে মাথা খুঁড়ে রক্তপাত করবো—তা বলে দিলুম।'

'তারা সব জানলে কখনও রাজী হ'ত না।' সর্বেশ্বর শেষ অবলম্বন হিসেবে বলে।

'তারা সব জানে বাছা—বনমালী কলকাতায় গিয়ে তোমার হালচাল সব দেখে এসেছে নিজে চোখে।'

'কী সর্বনাশ!' অতিকষ্টে সর্বেশ্বরের মুখ দিয়ে কথাগুলো বেরোয়।

'নে, এখন দাড়িফাড়ি কামিয়ে একটু সভ্য হয়ে নে দিকি।

ভদ্দরলোকেরা এখুনি এসে পড়বেন। ওঁরা সকালে আশীর্বাদ করবেন—আমরা যাবো বিকেলে। যা, চান ক'রে আয়। মুখে একটু জল দে—'

সর্বেশ্বর রাগ ক'রে বলে,—'আমি দাড়ি কামাবো না—চান করবো না—কিচ্ছু করবো না। মেয়ে দিতে হয় তো এমনি পাত্তরেই দেবে—আমি কেমন পাত্তর দেখেই দিক্ তারা···নাও, এখন একটু চা দেবে?'

॥ ২ ॥

বনমালী ঘোষাল কথা-মতো ঠিক এগারোটার সময় এসে উপস্থিত হলেন। সর্বেশ্বর ওঁরই অপেক্ষায় যেন ওৎ পেতে ছিল—বাগানের মুখেই ধরল তাকে। একহারা পাক্‌সিটে চেহারা বনমালীর। গলাবন্ধ সস্তা কোটের ওপর একটা পাকানো চাদর গলায় বাঁধা—হাতে একটা লাঠি এবং বগলে ছাতি। ওকে দেখে বেশ প্রসন্ন হাস্যেই বললেন, 'এই যে বাবাজী, এসে গিয়েছ। বেশ বেশ। জানি আসবে। বেয়ানও তাই ব'লে রেখেছিলেন—যে দেখো, ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে আমার ছেলেকে মিলিয়ে নিও। আমার অসুখ শুনলে আর সে থির থাকতে পারবে। হেঁ হেঁ—তা কথাটা ঠিক, স্নেহের টান একটা থাকবে বৈকি, থাকবেই তো!'

বাধা দিয়ে সর্বেশ্বর একেবারে কাজের কথা পাড়ল—'দেখুন, একটা কথা—বলি আপনাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

'কেন বাবাজী—কৈ সে রকম তো—'

'তা নইলে আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইতেন না। চেয়ে দেখেছেন আমার দিকে?'

'বিলক্ষণ! তোমাকে কি আজ থেকে দেখছি? সে-ই এতটুকু বেলা থেকে দেখে আসছি যে!'

'বলি এখন একবার তাকিয়ে দেখেছেন?'

'এইতো সেদিনও কলকাতায় তোমার বাসার পাশে উড়ে ঠাকুরের ফুলুরির দোকানে ঘাপ্‌টি মেরে বসে থেকে তোমায় দেখে এলাম—'

'আমার এই চেহারা দেখেও আপনার জামাই করতে ইচ্ছে করে?'

সর্বেশ্বর নিজের খোঁচা-খোঁচা দাড়ি ও ময়লা কোটে একবার হাত বুলিয়ে নেয়।

'বিলক্ষণ, চেহারা তোমার এমন খারাপটা কি বাবা? খারাপ ক'রে রেখেছ বৈ তো নয়! তা ছ্যাখো বাবাজী, ও অমন হয়। বেশী বয়স পর্যন্ত বিয়ে-থা না হ'লে—তার ওপর যদি একা একা বাইরে পড়ে থাকতে হয় তো—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নানারকম ছিট দেখা যায়। ঐ চেহারা কি তোমার থাকবে ভেবেছ? আমার মেয়ের পাল্লায় পড়ো—সে সব ঠিক হয়ে যাবে। মেয়েকে তো আমার এখনও দেখ নি বাবাজী। মেয়ে আমার খুব কড়া—শক্ত মেয়ে।'

বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে বলেন বনমালী ঘোষাল।

সর্বশ্বরের মুখ আরও শুকিয়ে ওঠে।—'কিন্তু আমার চাল নেই চুলো নেই, রোজগার নেই। মেয়ের ভবিষ্যতের দিকটা একবার ভাবছেন না?'

'কেন বাবাজী। চাল-চুলো এই তো দিব্যি রয়েছে। একটু পুরোনো? তা মেরামত করিয়ে নিলেই আবার বেশ চলবে। সব লোককে যে কলকাতাতেই থাকতে হবে তার মানেটা কি? তুমি কলকাতায় থাকবে কাজ-করবার দেখবে, শনিবারে শনিবারে বাড়ি

আসবে। তার আর গোলমালটা কি? আর ধরো ফি শনিবারেই যে আসতে হবে—তারই বা মানে কি? এই যে আমার জ্যেঠামশাই—তিরিশ বছর চাকরি করেছিলেন কলকাতায়, মোট একশ বাইশটি দিন দেশে এসেছিলেন তার ভেতর। জ্যেঠাইমা তো চিরকালটা দেশেই কাটালেন। তা কৈ, আত্মঘাতী হ'তে চেয়েছিলেন, কি—লুকিয়ে কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন এমনও তো শুনি নি। ছেলেমেয়ে জমিজায়গা নিয়ে তিনি দিব্যি ছিলেন।'

'কিন্তু মেয়ে আপনার কি খাবে তার খোঁজ রাখেন?'

'বিলক্ষণ! নইলে কি চোখ বুজে মেয়ে দিচ্ছি বাবাজী? কলকাতাতে আমার বড় ভাগ্নি-জামায়ের বাড়ি। সেও কম নয়, উকীল—পুলিসকোর্টের ডুঁদে উকীল। তা তাকেও বিশেষ দরকার লাগে নি আমি একাই সব করেছি। তিনদিন সেখানে থেকে, ধরো তা ঐ তিন-কুড়িং ষাট ঘণ্টাই বলতে গেলে, তোমার খবরাখবর নিয়েছি। রোজগার তুমি নানা রকমে করো তা আমি অনেকের মুখেই শুনেছি। খরচের হাত—দু'হাতে খরচ করো।···খেয়াল হ'লে রোজগার করো—নইলে দশদিন চুপ ক'রে শুয়ে বিড়ি খাও—এই তো? সব খবর আমার নেওয়া হয়ে গেছে যে! না জেনে শুনে কি আর হাত-পা বেঁধে জলে দিচ্ছি মেয়েকে ভেবেছ বাবা? ভবঘুরের মতো থাকা—ও একটা খেয়াল, শুনেছি বিলেতের দিকে ছেলেছোকরাদের মধ্যে অনেকেরই ও ব্যামো আছে। তা থাক্—ওসব খামখেয়াল বিয়ের আগে অমন একটু-আধটু ছোকরাদের থাকেই, ও কি আর ধর্তব্যের মধ্যে? ঘাড়ে জোয়াল পড়লে ব্যামোই বলো আর খেয়ালই বলো—কিছু থাকবে না! সে তুমি ভেবো না! আর আমার মেয়েও তেমন নয়, তাকে এখনও ছাখো নি তাই ভাবছ। সে তোমাকে দুদিনে তৈরি ক'রে নেবে, সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু শিষ্যে দেখা নাই!'

'কিন্তু'—প্রায় মরীয়া হয়ে ব'লে ফেলে সর্বেশ্বর—'কিন্তু আমার স্বভাবচরিত্রই যে একদম ভাল নয়। সে কথাটা কেউ বুঝি বলে নি আপনাকে?'

উচ্চাঙ্গের হাসি হাসেন বনমালী ঘোষাল, 'হাজার হোক তুমি ছেলেমানুষ বাবাজী। ও যে কাটান-মন্তর সে কি আর তুমি আমাকে শেখাবে? না, সে খোঁজ না নিয়ে আমি অমনি ছেড়েছি? সবাই বলেছে গঙ্গাজল—গঙ্গাজলের মতোই পরিষ্কার তোমার চরিত্র। তবে কখনও-সখনও একটু-আধটু দৈবে-সৈবে লুকিয়ে চুরিয়ে কিছু যদি ক'রেই থাকো সে কি আর ধরতে আছে—ধরো গঙ্গাজলেও তো কত কি ময়লা এসে পড়ছে। তাতে কি গঙ্গাজলের মহিমে কমে? তাছাড়া, মনে করো পুরুষ পরেশ, পুরুষের গায়ে ওসব দাগ লাগে না। যাক গে, এখন চলো বাবাজী—ভেতরে চলো—মিছিমিছি কথায় কথায় সময় পেরিয়ে যাচ্ছে!'

একরকম জোর ক'রেই তাকে টেনে আনেন বনমালী ঘোষাল—'কৈগো বেয়ান ঠাকরুণ, কোথায় গেলেন?⋯'

'এই যে, আসুন আসুন।⋯দেখেছেন ছেলের কাণ্ডটা। বললুম এত ক'রে যে ক্ষেউরি হয়ে চান ক'রে নে—না ইচ্ছে ক'রে অমনি জংলী হয়ে রইল।'

হাসিমুখে এগিয়ে এলেন পিসিমা।

'বিলক্ষণ। আজকালকার ছেলে ওরা, গায়ে ইয়ে মেখে যমকে এড়াতে চায় আর কি! ওরে বাবা, গায়ে ময়লা মাখলে যম হয়ত ছাড়ে—বৌ ছাড়ে কি?⋯আপনি মিছে মন খারাপ করবেন না বেয়ান। আপনার ছেলেকে আমি চিনে নিয়েছি—সেই জন্যেই তো কুটুম-সাক্ষাৎ নিয়ে আশীর্বাদ করতে আসি নি। একাই চুপি চুপি এসেছি! নিন, দেন দিকি একখানা আসন পেড়ে আর একঘটি গঙ্গাজল! ধান দুর্বো আমি দিচ্ছি—সব পকেটে ক'রেই এনেছি!'

'সেকি আর আমার যোগাড় ছিল না বেয়াই!' মৃদু অনুযোগ করেন পিসিমা।

'বিলক্ষণ, আপনি একা মানুষ, যদি না যোগাড় করতে পেরে থাকেন? তাই জন্যেই তো—!'

বনমালী ঘোষাল নিজেই উদ্যোগ ক'রে পুকুর থেকে পা ধুয়ে বেয়ান ঠাকরুনের হাত থেকে আসনখানা টেনে নিয়ে পরিপাটি ক'রে পেতে নিলেন। পাত্রের আসনখানা পিসিমা পাতছিলেন—'উঁহু, হ'ল না বেয়ান, হ'ল না, হ'ল না। পূর্বাস্য হয়ে বসতে হবে যে'—বলে নিজে আবার ঘুরিয়ে ঠিক ক'রে পাতলেন। তারপর সর্বেশ্বরের কনুইতে এক হ্যাঁচকা দিয়ে বললেন—'তাহ'লে আর দেরি ক'রে লাভ নেই বাবাজী—কি বলো?'

বলবার ফুরসুতও অবশ্য হ'ল না। স্তম্ভিত ও হতভম্ব সর্বেশ্বরকে প্রায় টানতে টানতেই এনে আসনে বসিয়ে দিলেন। গঙ্গাজলের ঘটি থেকে এক খাব্‌লা জল নিয়ে নিজের মাথায় খানিকটা দিয়ে বাকি সবটাই ছড়িয়ে দিলেন সর্বেশ্বরের গায়ে। হঠাৎ খানিকটা জল গায়ে লেগে সর্বেশ্বর চমকে উঠল। 'স্নান করে নিতে হয়—সেই কাজটাই সারা হয়ে গেল আর কি। বুঝলে না?' এই ব'লে মুচকি হেসে বনমালী 'ওঁ বিষ্ণু' ইত্যাদি ব'লে আচমন ক'রে নিলেন। সুউচ্চ কণ্ঠে গায়ত্রীটা সেরে যথারীতি সর্বেশ্বরের কপালে চন্দনের ফোঁটা লাগিয়ে ধানদুর্বা সিদ্ধি প্রভৃতি দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। এবং অম্লান বদনে নিজের পা দুটি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'তা হ'লে প্রণামটা সেরে নাও বাবাজী—যে কাজের যা।'

সর্বেশ্বর চোখমুখ বিকৃত ক'রে কোনমতে কাজটা সেরে নিল। তখন বনমালী আবার পা গুটিয়ে নিয়ে বললেন—'অমনি গায়িত্রীটা বাবাজী—যদি মনে থাকে তো একবার আউড়ে ফ্যালো।'

তারপর ট্যাঁক থেকে দশটি টাকা বার ক'রে ওর অনিচ্ছুক হাতের

মধ্যে গুঁজে দিয়ে বলে উঠলেন,—'মাধব, মাধব। সর্বকার্যেষু মাধব। ...শ্রীহরি শ্রীদুর্গা। মাগো, ভালয় ভালয় চারহাত এক ক'রে দাও মা!' এই ব'লে এক হুঙ্কার ছাড়লেন,—'কৈগো, বেয়ান ঠাকরুন। কী জলখাবার-টাবার দেবেন দিন। যে কাজের যা—শুভ কাজের নিয়মগুলো মানতে হবে তো। সময় নেই হাতে মোটে—আমাকে আবার এখুনি রওনা হ'তে হবে।'

পাড়ার দু-চারটি মেয়ে ইতিমধ্যে এসে গিয়েছিল। তাদেরই একজনকে পিসিমা ইঙ্গিত করলেন। সে শাঁখটা নামিয়ে রেখে ছুটে গিয়ে একথালা জলখাবার নিয়ে এসে বনমালীর সামনে সাজিয়ে দিল।

পিসিমা বললেন—'কিন্তু এখনই গেলে চলবে কি ক'রে? ভাত খেয়ে যাবেন না? এই দুপুর বেলা না খেয়ে যাবেন কি করে?'

মুখের মধ্যে একটা গোটা রসগোল্লা পুরে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বনমালী বললেন—'আর একদিন,—আর একদিন। সে আর একদিন হবে। আজ মোটে সময় নেই। আপনারা যাবেন, আমাকেই তো আবার ওদিকের গোছগাছ করতে হবে।' একা মানুষ—চার হাত তো আর বার করতে পারব না!'

॥ ৩ ॥

বনমালী চলে যাবার পর সর্বেশ্বর অনেকক্ষণ সেখানেই গুম্ হয়ে বসে রইল। একটা আহাম্মুকি ক'রে ফেলেছে সে আগেই—কোটটা খুলে পিসিমার ঘরের হুকে টাঙিয়ে রেখে এসেছে। শুধু গেঞ্জিটা আছে তার গায়ে। খানিকটা বসে থাকবার পর বার-দুই সতৃষ্ণ নয়নে সেদিকে চেয়ে দেখল সে। কিন্তু পিসিমা দাওয়া ছেড়ে নড়বার কোন লক্ষণই দেখালেন না।

অবশেষে একসময় প্রায় মরীয়া হয়েই উঠে পড়ল সর্বেশ্বর। ধীরে সুস্থে, সহজ নিরুদ্বিগ্নভাবে সে ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু জামাটার কাছে পৌঁছবার আগেই পিসিমা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন ওদিক থেকে,—'উঁহু—ওদিকে এখন যেতে হবে না সবু। বেরিয়ে আয় ওখান থেকে—'

সবু মুখখানাকে প্রাণপণে সহজ করবার চেষ্টা ক'রে বলে,—'না, মানে এই একটু পাড়াটা ঘুরে আসতুম।—অনেকদিন তো আসি নি দেশে।'

'এখন এই ঠিক-দুপুরবেলা পাড়া ঘুরতে যাবে তুমি!……বলে অন্য সময় ঠেলে পাঠাতে পারি না? ওসব হবে টবে না বাবা—সাফ ব'লে দিলুম।…তোমাকে আমি চিনি। দেখছ তো এই মেয়ের পাল। ও-বেলা আশীর্বাদ করতে যাবো তাও নয়নদার সঙ্গে এদের পাহারা রেখে যাবো। চারহাত এক হওয়ার আগে তোমাকে নজরছাড়া করছি নে!'

'কী মুশকিল, আমি কি তাই বলছি। আশীর্বাদই হয়ে গেল যখন—' সর্বেশ্বর উদাসীনভাবে আবার বাইরে এসে বসে। আমড়া-গাছটার দিকে চেয়ে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে থাকে আপন মনেই। যেন কোন উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তাই নেই ওর। কিন্তু মনে মনে চিন্তাটা চলতে থাকে সাংঘাতিক দ্রুতগতিতে। বেরোতেই হবে ওকে—যেমন ক'রে হোক পালাতে হবে। সে পর্যন্ত ঠিক হয়েই গেছে—এখন শুধু উপায়টা খুঁজে বার করা।

খানিকপরে একসময় পিসিমা তাড়া দেন, 'ও সবু, রান্না হয়ে গেল যে—এইবার মাথায় একটু তেল দিয়ে চান ক'রে আয়। তোর জন্যে কি সারাদিন বসে থাকব নাকি হাঁড়ি-হেঁসেল নিয়ে? বিকেলে আবার বেয়াই-বাড়ি যেতে হবে। সে-ও তো কম পথ নয়, একঘণ্টার রাস্তা। তিনটেয় না বেরোলে সময়ে পৌঁছোনো যাবে না।'

অকস্মাৎ যেন অন্ধকারে আলো দেখতে পায় সর্বেশ্বর। সোজা হয়ে বসে বলে, 'হ্যাঁ, এই যে যাই। তেলের বাটিটা দাও দিকি—'

তেলের বাটি হাতে ক'রে সে উঠে দাঁড়ায়। পিসিমা সন্দিগ্ধকণ্ঠে বলেন,—'ও কি, বাটি নিয়ে কোথায় চললি? এইখানেই মাথায় একটু দিয়ে নে না। গেঞ্জিটাও তো ছাড়লি না।'

'পিসিমা যেন কি!' আড়ে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে নিয়ে গলাটা নিচু ক'রে একটু অনুযোগের ভঙ্গীতে বলে সর্বেশ্বর—'এক পাল মেয়ে এনে ঘরে বসিয়ে রেখেছেন, তার ভেতর আমি খালি গায়ে তেল মাখব—না? তাছাড়া মাঠেও তো যেতে হবে একবার। ঘাটে বসেই তেল মেখে নেবো। গামছাখানা দাও দিকি—'

কাঁধে গামছা ফেলে বেরিয়ে যায় সর্বেশ্বর বেশ নিশ্চিন্ত ভাবেই। তারপর পুকুরঘাটের পাড়ে একজায়গায় তেলের বাটিটা রেখে গামছাখানা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে পেছনের বাগানে যায় সে। কিন্তু মাঠে বসবার তার কোন লক্ষণ দেখা যায় না, বরং একটু আড়ালে গিয়েই গতিবেগ বেড়ে যায় তার। এদিক ওদিক চেয়ে এক লাফে পেছনের পগারটা পেরিয়ে মল্লিকদের বাগানে গিয়ে ওঠে। তার পরও দাঁড়ায় না। ওদের পাঁচিলের তলা দিয়ে দিয়ে কোন মতে অপরের নজর এড়িয়ে এসে পড়ে চৌধুরীদের ঘাটে। তারপর সেখান থেকে আলের ওপর দিয়ে সোজাসুজি ছুটতে শুরু করে। দৌড়, দৌড়—খানা-ডোবা ডিঙিয়ে ঝোপঝাপ উজিয়ে দৌড়—দৌড়···

পিসিমা রান্নাবান্না এবং গল্পগুজবে খানিকটা অন্যমনস্কই ছিলেন। হঠাৎ কিছুক্ষণ পরে তাঁর খেয়াল হ'ল, 'হ্যাঁরে সবু এখনও তো চান ক'রে ফিরল না। মা শিবানী—একবার একটু এগিয়ে ছাখ্ না মা ঘাটে—'

শিবানী একটু পরে ঘুরে এসে বলল—'কৈ পিসিমা, সবুদা তো

ঘাটে নেই—তেলের বাটিটা তেমনি পড়ে রয়েছে। চানও বোধ হয় করে নি এখনও।'

'সে কিরে!...য়্যাঁ!...পালালো নাকি রে!'

'গেঞ্জি গায়ে খালি পায়ে কোথায় পালাবে পিসিমা? আপনি ব্যস্ত হবেন না। মাঠ থেকেই হয়ত এখনও ফেরে নি।'

'এখনও ফিরল না—এতক্ষণ ধরে মাঠ কিসের?...না না, সে সাংঘাতিক ছেলে মা—তার অসাধ্য কিছুই নেই। ছাখ্ ছাখ্ পেছনের বাগান, পগারধারটা একবার দেখে আয়, লক্ষ্মী মা আমার—'

পিসিমা নিজেও ছোটেন পাগলের মতো। কিন্তু না বাগান না পগার-ধার—কোথাও তার টিকি দেখা যায় না। পিসিমা কেঁদে ফেলেন একেবারে, 'যা ভেবেছি তাই। ছোঁড়া আমাকে দ'য়ে মজিয়ে পালাল দেখছি। ভদ্দরলোকদের কথা দেওয়া—সব প্রস্তুত, একি কেলেঙ্কারি মা! আমি লোকের কাছে মুখ দেখাব কি ক'রে রে!'

পিসিমা ডাক ছেড়ে কাঁদতে থাকেন। শিবানী, নির্মলা, ওরা যথাসাধ্য সান্ত্বনা দেয় ওঁকে। নির্মলা বলে—'আপনি অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? এরই মধ্যে সে আর কতদূর যাবে! দুপুরের ট্রেনও তো যায় নি এখনও। আমরা খোঁজ করছি। দেখি বরং কাউকে যদি সাইকেলে পাঠাতে পারি।'

'তাই ছাখ মা—তাই ছাখ!' চোখ মুছে সোজা হয়ে দাঁড়ান পিসিমা, 'তোরা এদিকটা ছাখ একটু, আমি বরং গিয়ে বনমালীকে খবরটা দিই। সে খুব মজবুত লোক—তার হাত এড়াতে পারবে না সহজে—'

'আপনি না খেয়ে চললেন কোথায় পিসিমা—যা হয় দুটো মুখে দিয়ে যান—'

শিবানী তাঁর হাত ধরে বলে।

'আর মা খাওয়া, এখন কি আর আমার মুখে ভাত উঠবে। সে ছোঁড়াটারও তো খাওয়া দাওয়া হ'ল না।···না মা, তোরা একটু ভ্যাখ। আমি ঘুরে আসি আগে। এখন আমার খাওয়া দাওয়া কিচ্ছু ভাল লাগছে না। আমাদের বংশে কখনও এ রকম কেলেঙ্কার হয় নি।···লোকে বলবে কি? পাড়াঘরে ঢিঢিক্কার পড়ে যাবে যে।'

তিনি চাদরটা গায়ে জড়িয়ে তখনই বেরিয়ে পড়েন।

বনমালী ঘোষাল কথাটা শুনে মুচকি হাসেন,—'ঠিক এইটিই ভাবছিলুম বেয়ান।···তা হোক, আপনি ব্যস্ত হবেন না। বলি ঘুরে-ফিরে উঠবে গিয়ে তো সেই কলকাতায়? আপনারা এদিকটা দেখুন। এখানেই ধরা পড়ে তো ভাল। নইলে আমি সন্ধ্যের ট্রেনে চলে যাচ্ছি কলকাতায়। ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকব। বাসায় ফিরেছে দেখলেই অমনি খপ ক'রে গে পড়ে টুঁটিটি টিপে ধরবো। পালাবে কোথায়? আমার নাম বনমালী ঘোষাল, আমার খপ্পর থেকে বেরিয়ে যাওয়া অত সোজা নয়।'

'যদি না আসতে চায়? সেখানে তো তার কোর্ট, যদি খুঁটি গেড়ে বসে?'

সংশয় ফুটে ওঠে পিসিমার কণ্ঠে।

কিন্তু ঠিক সেই সঙ্গেই মধুর হাস্যে অভয় দেন বনমালী, 'আপনি ক্ষেপেছেন বেয়ান? আমার হাত সে এড়াবে? এমন কাণ্ড করব —চেঁচামেচি বাধিয়ে পাঁচটা সত্যি মিথ্যে বানিয়ে ব'লে—যে বাবাজী আমার সুড়-সুড় ক'রে চলে আসতে পথ পাবে না। এখনও তো দুটো দিন সময় আছে, ভয় কি?'

তারপর মেয়েকে হাঁক দেন—'মা শঙ্করী, দে তো মা আমার চাদর আর ছাতাটা। এখনই ইষ্টিশানের দিকে রওনা হই।'

শঙ্করী যেন তৈরী ছিল। ছাতা আর চাদরটা বাপের হাতে

গুঁজে দিয়ে পিসিমাকে আশ্বাদ দেয়—'ভাববেন না পিসিমা। আমাকে চেনেন না আপনি—বে-টা হয়ে যাক—এর শোধ তুলে তবে ছাড়ব। ষোল-আনার ওপর আঠারো-আনা!'

॥ ৪ ॥

ট্রেনে চড়ে নি সর্বেশ্বর। পকেট নেই সুতরাং পকেটে পয়সাও নেই। ট্রেনে চড়তে গেলে টিকিট লাগবে। দ্বিতীয়তঃ ট্রেনের দিকেই ওপক্ষের যে প্রথম নজর পড়বে তা সে জানত। সুতরাং হাঁটা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। হাঁটতেই লাগল সে প্রাণপণে। কিন্তু সারাদিন হেঁটে বিকেল বেলায় বিষম ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ক্ষুৎপিপাসা তো আছেই। অবশেষে আর থাকতে না পেরে এক খাবারের দোকানের বাইরে-পাতা কাঠের বেঞ্চে বসে পড়ল। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে দম নিয়ে বলল,—'দোকানী ভাই, বামুনের ছেলেকে একটু জল খাওয়াবে?'

দোকানী ওকে বেঞ্চে বসা পর্যন্তই লক্ষ্য করছিল—এবার এগিয়ে এসে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, খাওয়াব বৈকি।' তারপর একঘটি জল হাতে ক'রে বেরিয়ে প্রশ্ন করলে,—'কিন্তু আপনার এমন ধারা হাল কেন বাবু? দেখলে তো আপনাকে ভদ্দরলোক ব'লেই মনে হচ্ছে। অথচ ময়লা জামা খালি পা, খালি গা—'

সর্বেশ্বর খানিকটা চুপ ক'রে চোখ বুজে বসে রইল তারপর একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললে,—'সে আর শুনে কি করবে ভাই—আমার আহাম্মুকির কথা?' তারপর আর একটু থেমে বললে,—'কাকী মারা গেছেন। আজ বাদে কাল ঘাট। খুড়তুতো ভায়েরা ধার-দেনা ক'রে টাকা দিয়েছে, শ্রাদ্ধের বাজার করতে চলেছি

কলকাতায়। পথে কুটুমবাড়ি নেমন্তন্ন সেরে যাবো ব'লে হাঁটা-পথেই বেরিয়েছিলুম, কাজ সেরে বাস্-এ চাপব।···অদৃষ্টের ফের ভাই, এক জায়গায় মুখ-হাত ধোব ব'লে জামাটা খুলে পাড়ে এক গাছের ডালে টাঙিয়ে পুকুরের ঘাটে নেমেছি।—ব্যস্—মুখে মাথায় জল দিয়ে এসে দেখি ফরসা। টাকা, ফর্দ সব ঐ জামার পকেটে! ফিরে গিয়ে কী ক'রে মুখ দেখাবো বলো দিকি? তাই রওনা দিলুম হেঁটেই—কলকাতায় পেঁ ৗছে বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে কিছু টাকা যোগাড় ক'রে কতক কতক বাজার সেরে তবে ফিরব। ফর্দর মোটা জিনিসগুলো মনেই আছে।···তাই এই চলেছি আর কি—না খাওয়া না চান, কখন পেঁ ৗছব কে জানে?'

আবারও একটু হাসে সর্বেশ্বর, অপ্রতিভের হাসি। তারপর হাতটা বাড়ায়—'দাও ভাই, জলটা—'

ওর রুক্ষ চুল, খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি, ধুলোসুদ্ধ খালি পা—সবই ওর কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করে। দোকানী একটু ইতস্তত ক'রে বলে,—'আজ্ঞে বামুন মানুষ, সারাদিন অভুক্ত, শুধু জলটা দিতে পারব না। একটু মিষ্টিমুখ করতে হবে।'

'না না ভাই, ওসব পাগলামি ক'রো না। জলই দাও। এদিকে আবার কবে আসব না আসব—তোমার দেনা হয়ত শোধই করতে পারব না। তাতে দরকার নেই।'

'আজ্ঞে আপনি ধার ব'লেই বা ভাবছেন কেন? কখনও তো সুযোগ হয় না—না হয় ব্রাহ্মণ-ভোজনই করালুম একদিন।'

ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে সর্বেশ্বর বলে—'কেমন ক'রে জানলে আমি বামুন? ও, এই পৈতেটা আছে ব'লে?' গেঞ্জির ফাঁক দিয়ে ময়লা পৈতেটা একটু টেনে বার করে সর্বেশ্বর। তারপর বলে—'কিন্তু কেমন ক'রে জানলে আমি ভণ্ড জোচ্চোর নই? সবটাই যে বানিয়ে বলছি না, তার প্রমাণ কি?'

দোকানীর বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত হয়। সে বলে,—'সে বাবু আপনার ধর্ম আপনার কাছে। বামুন মানুষকে আমি সারাদিনের পর শুধু জলটা দিতে পারব না। আপনার মুখ-চোখ বসে গেছে একেবারে!'

'শুধু জল দিতে পারবে না? তবে দাও কী দেবে। আমারও আর শরীর বইছে না—'

দোকানদার শালপাতার ঠোঙায় কয়েকটা মিষ্টি এবং কিছু লুচি তরকারি এনে দেয়। তৃপ্তি ক'রে খেয়ে এক ঘটি জল পান ক'রে আরামের নিশ্বাস ফেলে সর্বেশ্বর। তারপর বলে—'কিন্তু ভাই বামুন ভোজন করালে দক্ষিণে দিতে হয়, তা জানো তো?'

'আজ্ঞে, জানি বৈকি! যথাসাধ্য দেব।'

'উঁহু, উঁহু, যথাসাধ্য নয়। আমি বলছি।...এখান থেকে কলকাতার বাস-ভাড়া কত?'

'তা আজ্ঞে সাড়ে ছ' আনা।'

'তবে ঐ সাড়ে ছ' আনাই নেব। আর একটা বিড়ি।'

দোকানদার হেসে সাড়ে ছ' আনা পয়সা এবং গোটা-দুই বিড়ি হাতে দেয়। আঙুলে পৈতাটা গলিয়ে আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হাত তুলে সর্বেশ্বর বলে—'কল্যাণ হোক। তোমার ব্যবসার বাড়বাড়ন্ত হোক, ছেলে-পুলে সুখে থাক, গতরখানি ভাল থাকুক। কী ব'লে আর আশীর্বাদ করব। ভগবান যদি সুযোগ দেন কখনও—এদিকে আসার, তোমার ঋণ আমি ভুলব না ভাই।'

'আজ্ঞে ঋণ বলছেন কেন? ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়েছি—করাতে পেরেছি, ঋণ তো আমারই।

'পয়সার ঋণটাই কী বেশী হ'ল!' ওর কাঁধে হাত রেখে সর্বেশ্বর বলে।

দোকানীর কল্যাণে সন্ধ্যার একটু পরেই কলকাতা পেঁছে যায় সর্বেশ্বর। বাস থেকে নেমে বাসা পর্যন্ত হেঁটে যেতেও খুব কষ্ট হয় না। কিন্তু বিপদ হচ্ছে সেখানে ঢোকা। মেসের ব্যাপার—সন্ধ্যের ঝোঁকে কিলকিল করছে লোক, এই অবস্থায় ঢুকতে দেখলেই সবাই হৈ-চৈ ক'রে উঠবে। নানা প্রশ্ন, নানা কৈফিয়ৎ। কোনমতে সবার অলক্ষ্যে ঢুকতে পারলে এই ভাবটা দেখানো যায় যে অনেকক্ষণ এসে জামা-জুতো ছেড়েছে। এত কৈফিয়তের গোলমালে পড়তে হয় না। কিন্তু সেভাবে ঢুকতে গেলে সন্ধ্যার একটু পরে—আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ ঢোকাই সুবিধা। সেই জন্যে সে তখনই আর ঢোকবার চেষ্টাও করল না—খানিকটা পথে পথে ঘুরে বেড়াল।

কিন্তু বিধি বাম। এদিক ওদিক দেখে যেমন নিঃশব্দে সদরটি পেরিয়ে চলনে পা দিয়েছে—ওদিক থেকে প্রায় ঝড়ের বেগে গায়ের ওপর এসে পড়ল প্রভাত—মেসের মধ্যে যে ব্যক্তিটি তার ওপর সবচেয়ে চটা!

প্রভাত শৌখিন মানুষ, কী একটা ভাল আপিসে কাজ করে—কিন্তু বাড়ির অবস্থা মোটামুটি ভাল বলে সেখানে বিশেষ কিছু পাঠাতে হয় না, যা রোজগার করে বেশির ভাগই পোশাকে-আশাকে, বিছানায়, গন্ধতেলে, দামী সাবানে, হেয়ার লোশনে, স্নোতে, ক্রীমে খরচ করে। তার সকালে মুখ ধুতে লাগে এক ঘণ্টা—চুল আঁচড়াতে প্রতিবার কুড়ি মিনিট করে। চুল আঁচড়ায়ও দিনে রাতে অন্তত ছ সাতবার। স্নান করতে যে কত সময় লাগে তার হিসেব নেই। সেই কারণেই কোন দিন সময়ে অফিসে যাওয়া হয় না তার। নেহাৎ আজকালকার চাকরি বলেই আজও টিকে আছে।

এ-হেন প্রভাত ভাল ধোপদোস্ত কাপড় জামা ভেঙ্গে সবে তখন কোন্ বন্ধুর বাড়ি চা খেতে যাচ্ছে। সে বন্ধুর এক ভগ্নী এম-এ পাস

করেছে, চায়ের নেমন্তন্নটাও সেই উপলক্ষে। সুতরাং ওর সঙ্গে ধাক্কা লাগতেই সে যৎপরো-নাস্তি বিরক্ত হয়ে উঠল।

'এ হে হে! যাত্রাটাই মাটি! যত্ত সব অযাত্রা! নোংরা মানুষ!'

তারপরই বোধহয় কথাটা মনে পড়ে গেল—'আরে! আপনি না দেশে গিয়েছিলেন? সেখান থেকে এই অবস্থায় ফিরছেন?... কেন বলুন তো? পথে কারুর পকেট-মেরে ধরা পড়েছিলেন নাকি? তাই তারা জামা-জুতো খুলে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছে? কী ব্যাপার! নাঃ—আপনি দেখছি আমাদের মেসসুদ্ধ লোককে জড়াবেন।'

'আঃ—কী যে বলেন প্রভাতবাবু! থামুন না একটু।'

'থামব কেন মশাই? এ যে আমাদের সকলকার সেফ্‌টির প্রশ্ন!'

ততক্ষণে প্রভাতের উচ্চকণ্ঠে আরও দু-পাঁচজন নেমে এসেছে।

'ব্যাপার কি? কী হয়েছে কি?'

'আর কি হবে।' প্রভাত হাত পা নেড়ে বলে—'এই এঁর কাণ্ড! ভোরবেলা দেশে যাচ্ছি ব'লে বেরোলেন—এখন এইভাবে ফিরে আসছেন! বুঝে দেখুন ব্যাপারটা কি!'

'না তা নয়—মানে আমি তো খানিক আগেই'—থতমত খেয়ে যায় সর্বেশ্বর।

'খানিক আগেই কি? খানিক আগেই ফিরেছেন? এঃ, আবার মিথ্যে কথাও ধরলেন! এইমাত্র যে আপনার ঘর দেখে আসছি মশাই। চাবি দেওয়া। আপনার রুমমেট হরিশবাবু বেলা পাঁচটায় ফিরে আবার আমার সামনেই চাবি দিয়ে চলে গেলেন!'

'হ্যাঁ সেই তো! চাবির জন্যেই তো তাই—'

'কেন, আপনার ডুপ্লিকেট চাবি কি হ'ল? বেশ তো! চাবি না হয় হারিয়েছে, আপনার জামাজুতো কোথায় ছেড়ে রেখেছেন? ব্যাগ কই? কেন এমন অজস্র মিছে কথা বলছেন বলুন তো?'

সর্বেশ্বর হাল ছেড়ে দেয়। হতাশভাবে দুই হাত নেড়ে বলে,—

'ভেবেছিলুম বলব না।...আরে মশাই পিসি আমাকে মিছে ক'রে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল। অসুখ না ঘোড়ার ডিম। আসলে আমার বিয়ের সব ঠিক ক'রে রেখেছিল। কড়া নজরবন্দী মশাই—কোনমতে নাইতে যাবো ব'লে বেরিয়ে মাঠ-পগার ডিঙিয়ে সারাপথ হেঁটে এই ফিরছি।'

'য়্যানাদার পিস অফ হিজ ইঞ্জিনিআস্ ফেব্রিকেশ্যন্!' প্রভাত ব'লে ওঠে, 'আরে মশাই, এটা-ওটা ছেড়ে যদি নভেল-লেখা ধরতেন তাহলেও আপনার দুপয়সা হ'ত! এমন কি পকেটমারার চেয়েও ওটা লুক্রেটিভ!'

সর্বেশ্বর তর্ক বৃথা দেখে পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠে যায়। পিছন থেকে হাসির ঝড় ওঠে, সবাই বাহবা দেয় প্রভাতকে, 'বেড়ে বলেছেন প্রভাতবাবু, খাসা বলেছেন।'

এ সব জায়গার নিয়মই এই—বন্ধু আত্মীয় নির্বিশেষে, কেউ কাউকে ঠুকে দিলেই বাকী সকলে খুশী।

'হাসছেন কি আপনারা!' প্রভাত বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই ব'লে ওঠে—'লোকটাকে দেখলে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়...ও নাকি আবার বামুন! বলে ইস্কুলেও পড়েছে দিন কতক! ডার্টি সোআইন্!...রাস্তার ভিখিরীগুলো ওর চেয়ে পরিষ্কার। এক মেসে থাকতেও লজ্জা করে আমার। ম্যানেজারবাবু কী যে দেখেছেন ওর ভেতর—তা তিনিই জানেন।...এবার দেখছি ম্যানেজারই বদলাতে হবে। রামো, রামো। যাত্রাটাই মাটি ক'রে দিলে।'

কে একজন দলের মধ্য থেকে মধুরকণ্ঠে প্রশ্ন করল,—'কোথায় যাচ্ছিলেন প্রভাতবাবু? মানে—যাত্রাটা কিসের আবার? কোন শুভকার্যে যাচ্ছিলেন বুঝি?'

'না—ঠিক তা নয়। এই মানে একটা চায়ের নেমন্তন্ন—'

'সে কি! এই রাত আটটায় চায়ের নেমন্তন্ন? আপনার তো

পৌঁছতে পৌঁছতেই সাড়ে আটটা হয়ে যাবে।'

'কি ক'রে জানলি রে প্রদোষ, ওঁর সাড়ে আটটা হবে?' আর একজন ফুট্ কাটে।

'প্রভাতবাবুর চা খাবার তো ঐ একটিই জায়গা—বাগবাজার।… ওঁর এক অফিস-ফ্রেণ্ডের বাড়ি। ভদ্রলোকের অবিবাহিতা ভগ্নী নাকি ফাইন চা করেন।'

প্রভাত গর্জে ওঠে—'শাট আপ্!…যা জানেন না, তা নিয়ে কথা কইতে আসবেন না।…বলে, যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর! …ঐ জোচ্চোর মিথ্যেবাদী ডার্টি লোফারটা যেদিন যথাসর্বস্ব চুরি ক'রে বুকে ছুরি বসিয়ে পালাবে—সেদিন বুঝতে পারবেন প্রভাত পালের দাম। তার আগে নয়। আমি কালই এ মেস থেকে রিমুভ করবার চেষ্টা করব। আর একদিনও এখানে থাকা নয়—'

প্রভাত গজগজ করতে করতে বেরিয়ে যায়!

॥ ৫ ॥

সর্বেশ্বর স্নান সেরে ঘরে ফিরে কাপড় ছাড়তে ছাড়তেই—এসে ঢুকলেন বিপিনবাবু, মেসের স্থায়ী ম্যানেজার।

'এই যে সর্বেশ্বরবাবু। ফিরে এসেছেন আজই?…বাঁচলাম। কী শুনলাম—আপনি নাকি এক কাপড়ে পালিয়ে এসেছেন?'

'সে আর বলবেন না, পিসিমা বিয়ের ঠিক ক'রে রেখেছিল। আমি তো জানি না—বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়ে সেই জাঁতিকলে পা দিয়েছি। কড়া পাহারা একেবারে—যাকে বলে নজরবন্দী মশাই। কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি।'

'সে কি মশাই? বিয়ে তো আনন্দের কথা!…চিরকাল কি

এইভাবে ভবঘুরে বাউণ্ডুলে হয়ে থাকবেন নাকি ?···মাথার ওপর একটা রেসপন্‌সিবিলিটি এসে না পড়লে জীবনটা বাঁধা-খাতে বয় না—বুঝলেন ? ওটা দরকার। তাছাড়া হাজায় হোক বয়স হচ্ছে তো ? এখন একটু সেবা—একটু মাধুর্য—এসব না পেলে জীবনে রইল কি ?'

'রক্ষে করুন মশাই, সেবা-মাধুর্যের পেছনে যে ঠেলাটি আছে সেটা যে আমি বিলক্ষণ জানি। তাছাড়া বাঁধাখাতে জীবনটা বওয়াতেই আমার আপত্তি! আরে তাই যদি হবে, তাহ'লে কি আর আজ একটা ভাল চাকরি করতে পারতুম না ?···ঐ প্রভাত পালেরই আজ অফিসার হয়ে বসতে পারতুম—তা জানেন ?'

'সেকি ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ! আপনার অফিসের অজিত পিপ্‌লাইকে জিজ্ঞাসা করবেন। সেও তখন ঐ অফিসে ছিল। আমার মামা—গার্ডনার ওয়েস্টের বড়বাবু ছিলেন। ছিলেন কেন—এখনও আছেন। ওঁদের অফিসে সব মার্চেণ্ট অফিসের সাহেবরাই যাতায়াত করেন। মামা ব'লে কয়ে আমাকে চাকরিটি করিয়ে দেন। গেলেই চাকরীর কথা বলতেন ব'লে ওঁর সঙ্গে বড়-একটা দেখা করতুম না। একদিন ডেকে খুব ধমকে দিলেন, বোঝালেনও অনেক ক'রে। তখনকার মতো রাজী হয়ে গেলুম। পরের দিন যেতেই সাহেব স্লিপ দিয়ে বড়বাবুর কাছে পাঠালেন—বড়বাবু একেবারে দিলেন টুলে বসিয়ে। পঁয়তাল্লিশ টাকায় য়্যাপয়েণ্টমেণ্ট—বছরে পাঁচ টাকা বাঁধা ইনক্রিমেণ্ট, তাছাড়া প্রোমোশন আছে। বড়বাবু কথাগুলি শুনিয়ে দিলেন—আর চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলেন—কতটি ঘুষ দিয়েছি, এবং কাকে দিয়েছি।···ও মশাই, বসলুম তো! কিন্তু মনটা যে কি করতে লাগল কি বলব। মনে হ'তে লাগল কে যেন গলাটা টিপে ধরছে তুহাত দিয়ে।···ঐ স্ট্র্যাণ্ড রোডের ওপর দেড়শ বছরের বাড়ি, স্যাঁত-স্যাঁত

করছে ভিজে, গুমো গন্ধ। তার ওপর সে অফিসের ব্লকটা ভেতর দিকে। বাইরের আলো ঢোকবার কোন পথ নেই—দিনের বেলাতেই সার সার আলো জ্বেলে ঘাড়গুঁজে কাজ করছে সবাই। দেখে ভয় হয়ে গেল—এমনি ক'রে কাটাতে হবে জীবনের অন্তত ত্রিশটা বছর? শেষে আর পারলুম না—টিফিনের সময় টিফিন করবার নাম ক'রে সটান নিচে নেমে একেবারে হাওয়া।...তার পর সে পোস্টে যাকে নেওয়া হয়েছিল, সে-ই এখন প্রভাতদের সেকশনের বড়বাবু, দু'বেলা সেলাম দিতে হয় ওকে।'

'বলেন কি—অমন চাকরিটা ছেড়ে দিলেন? বরাতে দুঃখ আছে আপনার।' আফশোশের সুরে বলেন বিপিনবাবু।

'বন্ধন ছাড়া সব দুঃখই সইবে মশাই আমার! রুটিনবাঁধা জীবন আর ঘড়ি-ধরা কাজ—ঐ দুটি আমার সইবে না।'

'তা মামা কি বললেন?'

'সেই থেকে তো আমার মুখ দেখেন না আর! বলেছেন এবার তাঁর বাড়ি গেলে কুকুর লেলিয়ে দেবেন।'

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বিপিনবাবু বলেন—'যে যেমন বোঝে মশাই—এমন সব মুরুব্বী থাকতেও আপনার একটা হিল্লে হ'ল না। গ্রহ—নইলে এমন করাবে কে? খনার বচনে লেখা আছে না—সূর্য কুজে রাহু মিলে, গাছের দড়ি বন্ধন গলে! যদি রাখে ত্রিদশনাথ, তবু সে খায় নীচের ভাত। থাকয়ে রবি ভ্রময়ে ভূখণ্ড।...আপনার লগ্নের সপ্তমে অবশ্য রবি আছে।'

'রবি নয় মশাই—আছেন পবন। উনপঞ্চাশটি পাখায় ভর ক'রে নিজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আমাকেও ঘোরাচ্ছেন।'

বিপিনবাবু এইবার কাজের কথা পাড়েন—'সে যাক্‌কে যাক্‌, এখন আপনাকে আমার বড় দরকার। লোভে পাপ পাপে মৃত্যু গত শনিবারে আপনার কথা না শুনে বেশী লোভ করতে গিয়ে

মোক্ষম হেরেছি মশাই। মাইনের সব টাকাটিই উড়ে গেছে। মেসের টাকা থেকে ক-টা টাকা পাঠিয়েছি দেশে—কিন্তু তাতে তো কুলোবে না।—এ শনিবারে একটা সিওর টিপ দিন ভাই। এই নাক কান মলছি, যদি আর কোনদিন আপনার কথা না শুনি। এইবারটি আমায় তরিয়ে দিন—।'

সর্বেশ্বর গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়ে—'সে আর হবার যো নেই বিপিনবাবু।

'সে কি!' বিপিনবাবুর মুখখানা ঝুলে পড়ে,—'না না, ও কথাটি বলবেন না সর্বেশ্বর বাবু, মারা যাবো একেবারে।...দোহাই আপনার।'

'কী করব বলুন। খবর তো আর আপনি আসে না আসল কথাটা কি জানেন? টার্ফক্লাবের এক সাহেবের চাপরাশির সঙ্গে আমার একটু যোগাযোগ আছে। সে-ই ভেতরের খবরটা আমায় এনে দেয়। তাকে মাঝে মাঝে কিছু দিতে হয়। গত তিন মাস ধরে তাকে কুড়িটি টাকা দেব ব'লে প্রতিশ্রুত, দিতে পারি নি। গত হপ্তায় ভেবেছিলাম আপনার মোটামুটি কিছু লাভ হ'লে চেয়ে নেব। তা আপনি তো—। মোদ্দা সে কুড়িটাকা তাকে দিতে না পারলে আর মুখ দেখাতে পারছি না।'

'বলেন কি! তবে যে আপনি বলেন—ওসব আপনার ক্যালকুলেশান।'

'আরে তাই বলতে হয়! তা নইলে কথাটা পাঁচ-কান হোক, আর সে গরীব বেচারীর চাকরিটি যাক।'

বিপিনবাবু খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললেন—'আচ্ছা আমি আপনাকে কুড়িটা টাকা দিয়ে দিচ্ছি। আপনি কিন্তু আমাকে কালই খবরটা এনে দেবেন।—ডোবাবেন না যেন!'

'পাগল হয়েছেন আপনি?...এতদিন ডুবিয়েছি?'...

বিপিনবাবু উঠে গেলেন। একটু পরেই দশটাকার তুখানি নোট এনে সর্বেশ্বরের হাতে দিয়ে বললেন,—'আচ্ছা আপনি এত লোককে টিপ দেন—অথচ নিজে খেলেন না কেন?'

'ঐ তো মজা! বাইরে বসে ঠাণ্ডা মাথায় বেশ ক্যালকুলেশান করা যায়—মানে টিপ আনা যায়। কিন্তু মাঠে গিয়েছেন কি আপনার অবস্থা!—সব হিসেব আর টিপ ঘোড়ার ক্ষুরের ধুলোয় উড়ে যায়—সেই সঙ্গে ট্যাঁকের টাকাটাও। না মশাই—বেশ আছি। বোকা বটে তবে অত বোকা নই আমি।'

টাকা কুড়িটা ট্যাঁকে গুঁজে সর্বেশ্বর তার অতিশয় মলিন বিছানায় শুয়ে প'ড়ে একটা আরামসূচক শব্দ করে—'আঃ'!

বিপিনবাবুও উঠে দাঁড়ান—কিন্তু তখনই যান না, একবার বিছানাটার দিকে চেয়ে অনুযোগের সুরে বলেন, 'তা প্রভাতবাবু নেহাত মিথ্যে বলেন না মশাই—আপনি বড় অপরিষ্কার। বিছানা বালিশগুলো একবারও পরিষ্কার করার কথা মনে হয় না আপনার?'

'ঐ দেখুন! ও-ও এক রকমের বন্ধন। এখানে কথা হচ্ছে যে—যে শুচ্ছে তার কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা! আমার কোন অসুবিধাই নেই। ময়লা? আপনার গায়ের চামড়াটা দেখুন তো একটা মাইক্রোস্কোপে ফেলে—শিউরে উঠবেন দেখলে।—আপনার ভেতরে কত ময়লা আছে তা জানেন?···ঐ প্রভাত পালের মনের ময়লাটার কথা ভেবে দেখেছেন? পৃথিবীর কতটুকু ময়লাই বা সাফ করতে পারেন! মিছিমিছি বিছানাটার জন্য অত ব্যস্ত কেন?'

বিপিনবাবু হতাশাব্যঞ্জক একটা কাঁধ-নাড়া দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

॥ ৬ ॥

বিপিনবাবু বেরিয়ে যেতে হাতের বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আরও একটু টান হয়ে শোয় সর্বেশ্বর। সারাদিনের অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে—ক্লান্তিতে ত্ব'চোখের পাতা বুজে এসেছে তার ইতিমধ্যেই, কথা কইতে-কইতেই। কিন্তু ঘুম বা বিশ্রাম যেদিন ভগবান ওর অদৃষ্টে লেখেন নি। সবে সর্বসন্তাপহরা তন্দ্রার আভাস লেগেছে চোখে—মেসের বাইরের গলিতে সদ্য-পরিচিত একটি কণ্ঠের ডাক ধ্বনিত হ'ল—'বলি আমাদের সর্বেশ্বর বাবাজী ফিরেছেন নাকি? ও বাবাজী! সর্বেশ্বর!'

পর্দায় পর্দায় গলা চড়তে থাকে।

বনমালী ঘোষালের গলা। মুখ শুকিয়ে ওঠে সর্বেশ্বরের। সত্যিই তো, লোকটা এর আগে যে ওর মেস দেখে গেছে। সে কথাটা মনে রাখা উচিত ছিল।

ঠাকুর এসে ঘরে ঢোকে,—'এই যে মুখার্জিবাবু আছেন, কে একটি বুড়োমতো বাবু এসে খুঁজছে আপনাকে।'

'হ্যাঁরে—হাতে কি লাঠি আর ছাতা ত্বটোই আছে সে বাবুর?'

'হ্যাঁ বাবু। কোটের ওপর আবার একটা কোঁচানো চাদর বাঁধা!'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় সর্বেশ্বর, 'ঠাকুর, আমাদের ঐ পেছনের দিকের গলির দরজাটা খোলা যায়?'

'কেন যাবে না। ঐ দোর দিয়েই তো জমাদার আসে, সাফ্ করতে।'

'ঠিক আছে। আমি চললুম—ঐ গলিতে লুকিয়ে থাকব। আমার খবরটি যেন দিও না। তোমায় পাঁচটাকা পুরো বকশিশ দেব। আমায় তো জান, যে কথা সেই কাজ!'

'তা জানি! কিন্তু বাবুটি কে? ওর ভয়ে আপনি পালাচ্ছেন?'

'শ্বশুর—ঠাকুর—শ্বশুর। পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে ভয়ঙ্কর জীব।'

'শ্বশুর—আপনি বিয়ে করেছেন নাকি?'

'বিয়ে করলে কি আর পালাবার উপায় থাকত ঠাকুর—তখন শ্বশুর-কন্যেও তাড়া করতেন যে। সে বড় কঠিন বাঁধন। এ হ'লে-হ'তে-পারত শ্বশুর।'

এবার নিচের প্রবেশপথেই গলাটা বেজে উঠল—'ঠাকুর মশাই কোথা গেলেন গো? আর অত খবর দেওয়াদেয়িরই বা আছে কি? এটাতো মেস—কাউর ঝি-বৌতো থাকে না এখানে? আচ্ছা, আমিই যাচ্ছি।'

'সর্বনাশ, এসে পড়ল যে!—ঠাকুর যাও যাও—' কোনমতে আলনা থেকে আর একটা জামা টেনে নিয়ে গায়ে দিতে দিতে বেরিয়ে পড়ল সর্বেশ্বর।

কিন্তু ততক্ষণে নিচে সিঁড়ির মুখে এসে গেছেন বনমালী ঘোষাল। সর্বেশ্বর নিঃশব্দে পাশের একটা ঘরে ঢুকে পড়ে দোরটা ভেজিয়ে দেয়। বনমালী ঘোষাল লাঠি ঠক ঠক করতে করতে ওপরে ওঠেন। তারপর গলা-খাকারি দিতে দিতে যান সর্বেশ্বরের ঘরের দিকে। সর্বেশ্বর ইতিমধ্যে তরতর ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে পেছনের কানা গলিতেই বেরিয়ে পড়ে।

এধারে বনমালী ঘরে ঢুকে এই প্রথম একটু হতভম্ব হয়ে যান।

'আরে, গেল কোথায়! একি ভূতুড়ে কাণ্ড নাকি রে বাবা! এই শুনলুম ওপরের ঘরে আছে—এই একেবারে হাওয়া! বলি ও ঠাকুরমশাই—বাবাজী গেলেন কোথায় বলো তো?'

ঠাকুর রীতিমত বিস্ময়ের ভাণ ক'রে বলে—'ঘরে নাই আজ্ঞা?'

'অ—তুমিও বুঝি বাবুর দলে আছ?'

'আজ্ঞে?'

'বুঝলুম—বুঝলুম—তা আমার নামও যাকে বলে গে বনমালী ঘোষাল—বাবুকে শুনিয়ে দিও, বুঝলে! আমিও অত সহজে নড়ছিনি। এই গোড়া গেড়ে বসলুম। বাসা ছেড়ে আর কতদিন থাকবেন শ্রীমান? দাও দিকি বাপু এক কাপ চা আনিয়ে, গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে একেবারে। রাধামাধব।'

'আজ্ঞে তা দিচ্ছি—পয়সা?'

'বাবুর হিসেবে আনোগে—বুঝলে? আমি হলুম গিয়ে বাবুর শ্বশুর। আমাকে খাইয়েছ জানলে বাবু রাগ করবে না।'

'শ্বশুর? বাবু বিয়ে করেছেন নাকি?'

'ঐ তোমার নাম কি—ধরো গে করাই এক রকম! আর তুটো দিন, তুটো দিন সবুর করো—তুটো দিন পরেই বাবা ব'লে ডাকতে হবে। না ব'লে উপায় নেই। যাও, যাও—'

ততক্ষণে মেসের তু'চারজন লোক ওপরে এসে গেছে। প্রভাতও ফিরে এসেছে ততক্ষণে। সে-ই সকলকে ঠেলে সরিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল—'ব্যাপারটা কি বলুন তো? পালিয়ে বেড়াচ্ছে কেন? কেসটা কি? ফোরজারি? লারসেনি? চিটিং না অন্য কিছু? রেপ? মার্ডার?'

'রোস বাবা, রোস। ফৌজদারি আইনের ছড়া আউড়ে গেলে যে একেবারে! তুমি বুঝি ওর কোন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। বন্ধু ছাড়া এমন ছড়া আউড়ে হিতকামনা তো কেউ করে না!...তা বাবা অতদূর এখনও গড়ায় নি। কেসটা হ'ল গে সিম্পল্ ম্যাট্রিমনি —যাকে বাংলায় বলে বিবাহ।'

'অ, বিবাহ। তা বিবাহ হয়ে গেছে, না হবে?'

'হবে বাবা। হবারই তো কথা!'

'তা হ'লে পালিয়ে বেড়াচ্ছে কেন ও লোকটা অমন ক'রে?'

প্রশান্তহাস্যে মুখখানি রঞ্জিত হয়ে ওঠে বনমালীর,—'হবার

আগেই তো পালাবার কথা—পরে আর পালাবার জো কি! সে যে কঠিন বাঁধন!' তারপর একটু থেমে বলেন—'ছেলেমানুষী বাবা। তবে আর ছেলেমানুষী কথাটার সৃষ্টি হ'ল কেন?···বয়েস যতই হোক—বে-র সময় সবাই ছেলেমানুষ হয়ে যায়।···বে-র ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে!'

'বিয়ের আবার ভয় কি মশাই? মেয়ে কি আপনার তাড়কা না স্পূর্ণনখা?'

'ঠিক তা নয়। তবে ভেতরে ভেতরে ধরুন অনেকেই তো ঐ জাতীয়া, সাক্ষাৎ মহাপুরুষরাই বলে গেছেন—পলক পলক লোহু চোষে। তবে বাইরেটা মোহিনী না হোক—ঐ কাছাকাছি!···তার জন্যে নয় বাবা,···ভয় একটু হয়। সবাইকারই হয়। এই ধরো না কেন আমি। আমারই যখন বে-র কথা হয়—সাত রাত—সাতটি পুরো রাত—ভয়ে চোখে-পাতায় করতে পারি নি!'

প্রভাত একটু হতাশ হয়েই দাঁতে দাঁত চেপে বললে—'রাবিশ!'

প্রদোষ গলা নামিয়ে বললে,—'তাহ'লে সর্বেশ্বরবাবু তো ঠিকই বলেছিল, মিছিমিছি আমরা সন্দেহ করছিলুম—!'

নেমে যেতে যেতে প্রভাত বললে,—'চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা। ঐ এক দলের লোক—খবর নিয়ে জানুন?'

প্রভাত নেমে গেলে প্রদোষ জিজ্ঞাসা করলে,—'তা এখন কি করবেন আপনি, তাউই মশাই?'

'অবস্থান। আজকাল ঐ তোমরা যাকে বলো অবস্থান ধর্মঘট। ···টাকাকড়ি বিশেষ আনতে পারি নি তাড়াতাড়িতে। তা সর্বেশ্বর তেমন ছেলে নয়। এখন চালিয়ে নাও তোমরা—এরপর সে কড়ায় গণ্ডায় শোধ ক'রে দেবে'খন। বেশী কিছু আমার লাগে না বাবা—দৈনিক ধরোগে কাপ-দশেক চা, দশবারো ছিলিম তামাক—অভাবে এক বাণ্ডিল বিড়ি—আর দু'বেলা দু'মুঠো ভাত। জলখাবার? সে

দিলেও হয়, না দিলেও হয়।

প্রদোষ বললে—'এ-তো সামান্যই। তা একরকম ক'রে হয়ে যাবে। তা হ'লে থাকুন এখানেই। কিন্তু এই বিছানায়—থাকতে পারবেন?'

'থাকতেই হবে বাবা। এই গায়ের চাদরটাই না হয় ওপরে বিছিয়ে নেব। শুধু হাতে তো ফেরবার জো নেই। তাহ'লে সে মেয়ে আর তার গর্ভধারিণীতে মিলে জোড়া মহিষমর্দিনীর পার্টে নেমে যাবে। মহিষ কিন্তু পড়ব তখন গে আমি একটিই—বুঝলে না? থেকেই যাই—বাসা ছেড়ে আর ক-দিন থাকবে? ফিরতেই হবে একদিন।'

॥ ৭ ॥

পাশের কানা-গলিতে অনেকক্ষণ কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল সর্বেশ্বর। দাঁড়াবার জায়গা সেটা নয়, আশপাশের সব বাড়িরই নানাবিধ গৃহস্থালী জঞ্জাল—আনাজের খোলা, মাছের আঁশ, ময়লা কাগজ, ব্যাণ্ডেজের তুলো ইত্যাদি ফেলবার এইটিই একমাত্র স্থান। যেমন নোংরা তেমনি পিছল। কর্পোরেশনের লোক এসে প্রত্যহ সাফ করার কথা তবে সেটা ঘটে কালে-ভদ্রে। নেহাৎ প্রাণের দায়েই দাঁড়ানো। আশা ছিল যে বড় জোর মিনিট পনেরো চেঁচামেচি ক'রেই তার হ'লে হ'তে-পারত শ্বশুর বিদায় নেবে। কিন্তু ক্রমে সেই হ'লে-হ'তে-পারত শ্বশুরের কথাগুলো কানে যেতে আর সেখানে দাঁড়াবার প্রয়োজন রইল না।

বুঝল যে সে যা ভেবেছিল তার চেয়ে ঢের গভীর জলের মাছ বনমালী ঘোষাল। তখন অগত্যা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বড় রাস্তায়

বেরিয়ে পড়ল এবং লক্ষ্যহীনভাবে একটা দিক ধরে হাঁটতে লাগল। বাপ-মা-মরা ছেলে সে—পিসির আদরেই মানুষ। পিসিকে সে যথেষ্ট ভালবাসে, কিন্তু আজ তাঁকেই যেন চরম শত্রু ব'লে মনে হ'তে লাগল।

অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে কখন যে ভবানী শীলের লেনের মোড়ে এসে পড়েছে তা সে বুঝতেও পারে নি। হঠাৎ চমক ভাঙল গলির নেমপ্লেটটা চোখে পড়তে। সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় মনে পড়ে গেল, ওর বন্ধু সুনীলকান্তি এই গলিতে কোথায় থাকে। নম্বরটা মনে নেই অবশ্য। তাতে কি? সে প্রথম বাড়ি থেকেই প্রশ্ন করতে করতে এগোল—'হ্যাঁ মশাই, এ বাড়িতে সুনীলকান্তি চাকলাদার কেউ থাকে? কালো রোগা, একটু বাঁকা মতন চেহারা? থাকে না? আচ্ছা কিছু মনে করবেন না—বিরক্ত করলাম।'

—'কত নম্বরে থাকেন তিনি?' কেউ হয়ত প্রশ্ন করে।

'নম্বরই যদি জানব তাহ'লে এ ভাবে বিরক্ত করব কেন? গলির নামটা মনে আছে এই ঢের। যে বাজার, আজকাল লোকে নিজের বাপের নামই ভুলে যায়।'

সে হয়ত উত্তর দিলে,—'কিন্তু এভাবে আপনি কলকাতায় বাড়ি খুঁজে বার করতে পারেন? নম্বর না জানা থাকলে—'

'কিছু না কিছু না—কোন অসুবিধাই নেই। এইটুকু তো গলি, স্রেফ্ থিওরি অফ্ এলিমিনেশান চালাব—বুঝলেন না? বাদ দিতে দিতে একটা বাড়িতে পাত্তা মিলবেই?...আচ্ছা চলি।'

সে আবার এগিয়ে যায়। অবশেষে এক সময় তার উদ্যম পুরস্কৃত হয়। দেখা যায় যে বেশী দূর নয়—১।৩।১৭।এফ নম্বরটিতেই সুনীলকান্তি চাকলাদার ভাড়া থাকেন। দোতলা বাড়ি; বিশফুট রাস্তা থেকে বারোফুট ঢুকে, তা থেকে ছফুট চওড়া কানাগলিতে

পড়লেই বাড়িটা পাওয়া যাবে। অন্ধকার গলি, নিচের তলায় দিনের বেলাও আলো জ্বালাতে হয়। সেই জন্যে বাড়িওলা নিচের ঘরে আলোর পয়েন্টের জন্যে দুটাকা ক'রে বেশী নেন। তা হোক, রাতে তার জন্যে অসুবিধে নেই। সব বাড়িই একরকম দেখায় রাত্রিবেলা।

'সুনীল, সুনীল' ক'রে হাঁক দেয় সর্বেশ্বর। অনেকক্ষণ পরে শতছিন্ন একটি গেঞ্জি গায়ে দিয়ে বেরিয়ে আসে ওর বন্ধু সুনীলকান্তি চাকলাদার।—'কী ব্যাপার! সর্বেশ্বর, তুই এতকাল পরে?'

'শোন্'—ব'লে একেবারেই কাজের কথা পাড়ে সর্বেশ্বর, 'আমাকে দিন দুই-এর জন্যে একটু আশ্রয় দিতে পারিস?'

যেমন সোজা প্রশ্ন তেমনি সোজা উত্তর দিল সুনীল,—'উঁহু, তা সম্ভব নয়। দশ-বাই-বারো ঘরে আমরা সাতটি প্রাণী থাকি। তার মধ্যে তুমি নাক গলাবে কেমন ক'রে?'

'বুঝলাম। ঘর ভাড়া আছে?'

'না, তাও নেই। বারোখানি ঘর এবাড়িতে। বাড়িওলাকে নিয়ে বারোটি ফ্যামিলিই থাকে।'

'তা হোক, ডাক দেখি তোর বাড়িওলাকে।'

'ঘর নেই বলছি—'বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'ডাক্ না তুই ভদ্রলোককে। তোর অত কথায় দরকার কি?'

আর দ্বিরুক্তি করে না সুনীল। চলনের মুখে গিয়ে ডাকে—'প্রতাপবাবু, ও প্রতাপবাবু', তারপর ভেতর থেকে সাড়া মিলতে ফিসফিস ক'রে বলে সর্বেশ্বরকে—'শ্বশুরের বাড়ি এটা। আর কোন রোজগার নেই, এই ভাড়া থেকেই সংসার চলে। ভারি কঞ্জুষ।'

একটু পরেই খাটো পাঁচহাতি ধুতি প'রে প্রতাপবাবু নেমে আসেন। হাতে একটি আধপোড়া বিড়ি মোলায়েম কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, 'ডাকছিলেন সুনীলবাবু?'

'আজ্ঞে, আমি নই ঠিক, আমার এই বন্ধু—ইনি আপনাকে খুঁজছিলেন। বল্ না রে কী বলবি—এঁরই নাম প্রতাপচন্দ্র দত্ত, আমাদের বাড়িওলা।'

'নমস্কার। বিরক্ত করলুম হয় তো—কিন্তু বড় প্রয়োজন পড়েই—মানে আমি একটু ছোটখাটো আশ্রয় খুঁজছিলাম। অবিশ্যি ভাড়া দেব।'

মুখে অদ্ভুত একটা চু-চু শব্দ ক'রে প্রতাপবাবু বলেন,—'তাইতো—আপনি বড়-মুখ ক'রে বললেন একটা কথা—কিন্তু কোন উপায়-ই যে নেই! বাড়িতে আমার ডেরাটা বাদ দিলে দাঁড়ায় এগারোখানি ঘর। তা ধরুন ঘেটের—এগারোটি ফ্যমিলিই আছে আপাতত। আপনাকে কোথায় থাকতে দিই বলুন?'

'আজ্ঞে যদি অনুমতি করেন—আমি ঠিক খুঁজে নেব। আমাকে একবার বাড়িটা দেখতে দেবেন?'

প্রতাপবাবু করুণার হাসি হাসেন একটু—'দেখুন আমরা হলুম গে বৌবাজারের দত্ত। ভবানী শীলের দোউত্তুর বংশ আমরা, জঙ্গল কেটে আমরাই এতবড় শহরটা গড়েছি। ভাড়া দেবার জায়গা আছে অথচ ফেলে রেখেছি, এমনটা ভাবছেন কেন?'

'আজ্ঞে, আমিও হলুম গে বামুন—মুখুজ্জে, ফুলের মুখুটি। আমরা আবার আপনাদের ঠকিয়ে খেয়েছি চিরকাল। এই পাথর থেকে রস বার করি যখন—তখন আমরা ঠিক খুঁজে নিতে পারব। আমি এক দিন মাত্র এসেছিলুম—কিন্তু তবু মনে আছে, দোতালার সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার মুখটাতে একটা চোরা-বারান্দামতো আছে না? কোনমতে একটা লোক শুতে পারে বোধ হয়—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে বটে। তবে সেখানে ভাড়াটেদের কাঠ-ঘুঁটে থাকে।'

'বিলক্ষণ! তাদের কাঠঘুঁটের জন্যে আপনার একটা আয় মাটি

করবেন? ঐটিই আমাকে ভাড়া দিন—আমি মাসিক ছটি টাকা ভাড়া দেব।'

লোভে ও ঔৎসুক্যে প্রতাপবাবুর চোখ-ছুটি জ্বলতে থাকে। তবু বলেন—'কিন্তু তার যে তিন দিক খোলা—রোদ আছে জল আছে। তাছাড়া—'

'পর্দা টাঙিয়ে নেব আমি, সে আমার খরচ। মোটা চটের পর্দা। যদি উঠে যাই আপনারই থাকবে।'

কিন্তু প্রতাপবাবু তাঁর আগেই কথারই জের টানেন, 'তাছাড়া আমার সব ফ্যামিলি ভাড়াটে। আপনাকে,—একা পুরুষমানুষ—ভাড়া দিই কি ক'রে?'

'কি মুশ্‌কিল—এই তো সুনীলরাই রয়েছে। ওর ফ্যামিলি আর আমার ফ্যামিলি কি আলাদা? হরিহর আত্মা যে। এক গলায় জল ঢাললে দু গলায় পড়ে। নেহাৎ ওদের ঘরে জায়গা নেই —মানে মাপে বেরোয় না, ছ'ফুট বাই দু'ফুট এই বারো বর্গফুট তো চাই কম্‌সে কম—তাই এত কষ্ট।

'তা ভাড়াটেরা যদি জিজ্ঞেস করে?'

'বলবেন—সুনীল আমার নিকট আত্মীয়—ধরুন আমার স্ত্রীর ভাই।'

সুনীল একটা অস্ফুট কি গালাগাল দিয়ে নিলে। সর্বেশ্বরও চুপিচুপি উত্তর দিলে, 'তুইও তো তাহ'লে সম্বন্ধটা মেনে নিলি রে ইস্টুপিড!

সে রাতটার মতো সুনীলের কাছ থেকে একটা মাদুর আর বালিশ ধার ক'রে নিয়ে কাটল। ভোরবেলা উঠে গিয়ে নিজেদের গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে বিপিনবাবুর সঙ্গে দেখা করলে সর্বেশ্বর। আশা ছিল যে হয়তো গভীর রাত পর্যন্ত দেখে হতাশ হয়ে ফিরে গেছে

লোকটা—কিম্বা অন্তত আজ সকালে রওনা হয়ে গেছে। কিন্তু দেখা গেল যে মানুষ চিনতে এখনও তার বহু বিলম্ব, শুনলে, বনমালী ঘোষাল খোসমেজাজে বহালতবিয়তে এখনও তার ঘরে অধিষ্ঠান করছেন এবং পালা ক'রে বাকী সমস্ত অধিবাসীদের ঘাড় ভেঙে চা খেয়ে যাচ্ছেন ক্রমাগত।

আবারও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে সর্বেশ্বর। বিপিনবাবুকে তাঁর 'সিওর টিপ' দিয়ে বাজারে গিয়ে গোটা তুই চটের পর্দা এবং সামান্য একটু বিছানা কিনে নিয়ে ভবানী শীলের লেনে ফিরল। পাকাপাকি-ভাবে ওখানে বাসা বাঁধতে হবে এখন, অন্তত কিছুকাল।

সেই দিনই সর্বেশ্বর বাকী ভাড়াটেদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তুলল।

বাজার থেকে ফিরে পর্দা টাঙাচ্ছে হঠাৎ কানে গেল—একটি বৃদ্ধা মহিলা বেশ চেঁচিয়েই প্রতাপবাবুকে বলছেন—'বলি অ বাড়িওলা ছেলে, এ তোমার কি রকম ব্যাভার গা বাছা। বলি তুমি আমাদের কাছ থেকে মাস মাস টাকা নাও, না দয়া ক'রে অমনি থাকতে দিয়েছ?'

'কেন বলুন তো পিসিমা—কি হয়েছে? কি করলুম?'

'কি না করলে বাছা? বলি বলা নেই কওয়া নেই কোথা থেকে একটা হাড়-হাবাতে বাউণ্ডুলে, বখাটে ছোকরাকে এনে ঢোকালে! ওর যা চেহারা, দেখলেই তো বোঝা যায় জোচ্চোর বখা ছোকরা। গাঁজাগুলির আড্ডা থেকে সবে উঠে এসেছে! এবাড়িতে এতগুলো লোক মেয়েছেলে নিয়ে বাস করছে সে কথাটা ভাবলে না একবার? আক্কেলটা কি তোমার? বলতে পারলে না যে পরিবারে মেয়ে-ছেলে নিয়ে আসুন, তবে ভাড়া দেবো?'

'আজ্ঞে—সুনীলবাবুর আত্মীয় ব'লেই—'

'কিসের আত্মীয় সুনীলবাবুর? চোদ্দপুরুষের নাউখোলা

আমার! মুখুজ্জ্যে আর চাকলাদার আত্মীয় হয়? আমরা বামুন নই? আমরা জানি না কিছু? বাবা, আমরা হলুম গিয়ে নৈকুষ্যি কুলীন, আমার দাদামশাই কখনও ভেন্ন গোত্তরের জলে পা ধোয় নি···। ঠক জোচ্চোর লোক, এটা তুমি বুঝলে না? এই বুদ্ধিতে তুমি বিষয় দেখবে? বলি বয়েস তো হয়েছে। ছেলেমানুষটি তো আর নেই—'

একটি বছর পনেরো-ষোলর মেয়ে বালতি হাতে বোধকরি নিচের কলতলায় জল আনতে যাচ্ছিল। সর্বেশ্বর তখন একটা পেরেক মুখে চেপে আর একটা বাঁকা পেরেক দুহাতে সোজা করার চেষ্টা করছিল, এখন সেটা মুখ থেকে নামিয়ে মেয়েটিকে ডাকলে—'শুনুন—'

মেয়েটি কিন্তু সে ডাক কানেই তুলল না। যেমন অন্যমনস্কভাবে যাচ্ছিল তেমনিভাবেই সিঁড়ি দিয়ে নামবার উপক্রম করল। সর্বেশ্বর আবার ডাকল—'শুনছেন, শুনুন—'

এইবার মেয়েটি ফিরে তাকাল। তার চোখে যৎপরোনাস্তি বিস্ময়।

'আমাকে ডাকছেন?'

'হ্যাঁ—আর কে আছে এখানে?' একটু বিদ্রূপের সুরেই বলে সর্বেশ্বর।

'আমি বুঝতে পারি নি। আমায় তো কেউ ওভাবে ডাকে না।'

'তবে কি ভাবে ডাকে?'

'আমার নাম টেঁপি। আমাকে তাই ব'লেই ডাকে। আপনি-আজ্ঞে কেউ করে না।'

'ও, টেঁপি নাম বুঝি? তোমার বাবার নাম কি? কোন্ ঘরে থাকো তোমরা? বাবা কি করেন?'

'আমার বাবার নাম মহিমচন্দ্র চক্রবর্তী—ছাপাখানায় কাজ

করেন। ঐ ওধারের কোণের ঘরটায় আমরা থাকি।'

'আচ্ছা, ঐ যে বুড়িটা অত বকাবকি করছে নিচে—কে বলো দিকি?'

মেয়েটা আরও একটু কাছে সরে আসে। গলা নামিয়ে বলে—'ও বামুন-পিসি। ভারি বদমাইস বুড়ি। ওকে সব্বাই ভয় করে।'

'কেন, ভয় করে কেন?'

'ও যে জিনিসপত্তর বাঁধা রেখে টাকা ধার দেয়—সুদও নেয় তেমনি অবিশ্যি কিন্তু সকলেই কিছু-না-কিছু ধারে ওর কাছে, সেই জন্যে কেউ রাগাতে সাহস করে না।'

'ওর আর কেউ নেই?'

'কে এক ভাইপো আছে—তা তাকেও আমল দেয় না। মাঝে মাঝে আসে খবর নিতে, তাকে দিয়ে বাজার-হাট করিয়ে নেয় কিন্তু কখনও একটা বাতাসা হাতে দিয়ে জল খেতে বলে না। হাড়কিপ্‌টে বুড়ি—বলে ওরা সব আমার বিষয় টেঁকে বসে আছে।'

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে যায় টেঁপি।

ওধার থেকে বোধ করি তার মা-ই ডাক দেন—'বলি অ টেঁপি, তোর জল নেওয়া হ'ল?'

'যাই এখন—য়্যাঁ?' টেঁপি দ্রুত নেমে যায়।

সর্বেশ্বরও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসে। বামুনপিসি তখন স্নান সেরে ভিজে কাপড়েই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রতাপবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করছেন। সর্বেশ্বর তরতর ক'রে নেমে এসেই তাঁকে গড় হয়ে এক প্রণাম ক'রে বেশ ভক্তিভরেই পায়ের ধুলো নেয়।

'ওমা—এ আবার কি! হাঁ-হাঁ বাছা, করো কি? এই চান ক'রে এলুম যে—এখনও পূজো-আচ্চা বাকি, এ আবার কি ঢঙ্‌?'

সর্বেশ্বর হাত জোড় ক'রে বলে—'আপনি তো এখনও ভিজে কাপড়ে আছেন মাসিমা, ছুঁলেই বা দোষ কি?'

'দরকারই বা কি বাছা? কথায় বলে অতিভক্তির গলায় দড়ি।'

'মাসিমা, বামুনের ছেলে, নেহাৎ কারে-পড়েই আশ্রয় নিয়েছি, তাড়িয়ে দেবেন?'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই জামার ভেতর থেকে অতি-মলিন পৈতেটা বার করে।

বামুনপিসি একটু নরম হয়ে যান প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—'আমি তাড়াবার কে বাবা? তুমি বাড়িওয়ালার কাছে থেকে ভাড়া নিয়েছ, টাকা দিয়েছ গুণে। আমি বললেই বা তুমি যাবে কেন?'

'তা কি হয় মাসিমা? আপনি হলেন এঁদের মায়ের মতো। আপনি না মত দিলে তাঁরাই বা রাখবেন কেন? আর আমিই বা থাকব কেন?'

'তা থাকো না বাছা—আমি কি আর তোমাকে তাড়াবার কথা বলেছি? পেরতাপকে তার আক্কেলের কথাটাই বলছিলুম। বয়েস হয়েছে, এখন তো আর ছুটো পয়সার লোভে যা-তা একটা কাজ ক'রে বসলেই চলবে না, বুঝে-সমঝে চলতে হবে। তা তুমি এত নোংরা কেন বাছা? বামুনের ছেলে একটু সাফ হয়ে থাকতে পারো না?'

'আমি যে বাবা সর্বেশ্বরের দোর-ধরা ছেলে মাসিমা। বাবার নিষেধ—আমাদের খুব পরিষ্কার হ'তে নেই।'

'ও, তাই তো বলি। তা থাকো বাছা, থাকো। পরের ঝি-বৌয়ের দিকে উঁচু নজরে চেয়ো না, তা হ'লেই হ'ল!'

•

এর দিন ছুই পরেই একদিন সকালে—চাকুরেরা বেরিয়ে গেলে বেলা দশটা নাগাদ টেঁপিকে দেখতে পেয়ে সর্বেশ্বর ডাকে—'অ খুকী—কি যেন তোমার নাম, টেঁপি না? শোন একবার।'

টেঁপি কাছে এসে দাঁড়ায়।

'আচ্ছা এ বাড়িতে কারুরই কোন চাকর-টাকর নেই, না?'

'না,—তো। দু একজনের ঠিকে-ঝি আছে তারা কাজ ক'রে দিয়ে চলে যায়। কেন বলুন তো।' টেঁপি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

'না—মানে, এই এক বাণ্ডিল বিড়ি আনাতুম আর কি!'

'এই কথা। তা বেশ তো, আমাকেই পয়সা দিন না, আমি এনে দিচ্ছি।'

'না না, ছি! সে কখনও হয়।...তুমি দোকানে গিয়ে বিড়ি আনবে কি?'

'তাতে কি হয়েছে। আমি তো যাই-ই। বাবার বিড়িও তো এনে দিই। তাছাড়া দোকান-পাট তো আমাকেই প্রায় করতে হয়। সকালে তো দু'ঘণ্টা মোটে সময় বাবার—সে বাজার করতে, দুধ আনতে, ডাক্তারখানায় যেতেই কেটে যায়। দোকান তো আমাকেই করতে হয় বেশির ভাগ দিন।' তারপর একটু থেমে বলে, 'এই তো আমি চিনি আর ডাল কিনতে যাচ্ছি, দিন না, এনে দেব।'

সত্যি সত্যিই পয়সা চেয়ে নিয়ে বিড়ি কিনে দিয়ে গেল টেঁপি, এমন কি তার বদলে সর্বেশ্বর নগদ একটা পয়সা দেবার প্রস্তাব করতে কিছুতেই নিতে রাজী হ'ল না। তবে তাকে ধরে এ বাড়ির আরও অনেক ভাড়াটের ব্যক্তিগত ইতিহাস সংগ্রহ ক'রে নিল সর্বেশ্বর, কে কেমন মানুষ, কী করে—ইত্যাদি।

অবশ্য কতক তো সে নিজেই দেখে—এবং শোনেও।

ভোর হ'লেই এ বাড়ির কলতলায় শোরগোল পড়ে যায়।

'বলি কল তো কারুর একার নয়। সবাই তো ভাড়া দেয়, না কি?'

'একার কে বলছে, বলি একার নয় বলেই তো আমরাও দু চার

বালতি জল আশা করি!'

'ও দিদি, আপনার তো এক ঘড়া হ'ল—আমাকে এবার একটু নিতে দিন। আমার উনুন জ্বলে গেল—ডাল চাপাবার মতো একঘটি জলও নেই।'

বামুনপিসির গলার আওয়াজ সবার ওপরে ওঠে—'আ মর্! চোখখাকীরা যেন কলতলাটাকে নরক ক'রে তুলেছে। কে বলবে যে ভদ্দরলোকের বাড়ি এটা? আমি গতর পিষে মরব আর সব আঁটকুড়ীর বেটাবেটীরা এধার থেকে নোংরা করবে। নিপাত যাক সব, নিপাত যাক!'

'বাড়িওলা মিন্‌সে ভাড়া নেবার বেলা তো ঠিক আছে—মাস পোয়াতে তো তর সয় না। এদিকে দেখতে পায় না? তাড়াতাড়ির সময় একজন যদি আধঘণ্টা কল জোড়া ক'রে বসে থাতে তো চলে কি করে?'

'বেশ তো, না পোষায় উঠে যা না। পেরতাপ দত্তের অমন ঢের ভাড়াটে জুটবে।' বামুনপিসি চান করতে করতেই গজরাতে থাকেন।

তার সঙ্গে চলে ভগবানের নামও—

'গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী,
নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেঽস্মিন সন্নিধিং কুরু॥
গয়াগঙ্গা বারাণসী প্রভাসে পুষ্করাণি চ কুরুক্ষেত্র,
তীর্থান্নেতানি পুণ্যানি স্নানকালে ভবন্তিহ॥'

'মা গঙ্গা—অন্তে পায়ে ঠাঁই দিও মা! শিবকাশী শিবকাশী কাশী কাশী শিবশিব!'

'হ্যাঁরে এই—অ অতসী, কী তোর আক্কেল লা, এইখানে আমি কুঁজো বসিয়েছি আর ছরছর করে এঁটো জলটা ঢাললি!'

'কৈ ছরছর করে জল ঢাললুম কাকীমা, পাছে ছিটে যায় বলে

আমি যার দেওয়াল ঠেকিয়ে কত আস্তে আস্তে ফেললুম—বা রে!'

'যেন সব বাবাকেলে কল পেয়েছে! মৌরসী পাট্টা! কলে ঢুকলে আর কেউ বেরোয় না। পাঁচজনের কল—একটু বুঝে সমঝে চলতে হয়।'

যেন বাতাসকে শুনিয়ে বলে একজন।

ভেতর থেকে অপরে বলে—'ভাড়া দিচ্ছি বাস করছি, অত গালাগাল দেবার কি আছে। আমার বাবাকেলে কল না হয় না-ই হ'ল—তোমারই কি বাবাকেলে কল নাকি! কথার ছিরি দেখো না!'

সেইদিনই সন্ধ্যেবেলা সর্বেশ্বর বাইরে থেকে ফিরে চুপিচুপি টেঁপিকে বলে,—'টেঁপি শোন। এই যে এদিকে—'

টেঁপি কাছে আসতে কাগজের একটা ঠোঙা তার হাতের মধ্যে প্রায় গুঁজে দিয়ে বলে—'এগুলো তোমার ভাইবোনদের দাও গে, তুমিও খেও।'

'কী এতে?' চোখ বড় বড় ক'রে টেঁপি প্রশ্ন করে।

'টফি আছে। ভাল টফি।'

টফি বুঝতে পারে না টেঁপি। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

'মিষ্টি মিষ্টি খেতে—লজেঞ্চুসের মতো। বুঝলে?'

লোভে ও প্রত্যাশায় টেঁপির মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তবুও সে বলে—'মা যদি বকে?'

'বকবে কেন? ব'লো যে তোমার এক দাদা দিয়েছে, কেমন?' তারপর একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলে,—'তোমাদের এখন চা হবে নাকি টেঁপি?'

'এই বাবা এলেই হবে। কেন—খাবেন আপনি?'

'যদি তোমার মা বিরক্ত না হন—'

'না না, বিরক্ত হবেন কেন? আমি দিয়ে যাবো'খন—'টেঁপি প্রায় ছুটতে ছুটতে চলে যায় টফির ঠোঙাটা হাতে নিয়ে।

এদিকে মেসের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে। বনমালী ঘোষাল পুরোদস্তুর অবস্থান করছেন, আর সে অবস্থিতির মাহাত্ম্য প্রতি-নিয়তই এই বাসার অধিবাসীরা অনুভব করছে। প্রদোষ তো সেদিন সকালে প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়েই বিনয়বাবুর ঘরে ঢুকল—'দেখুন তো বিনয়দা—এ কী অত্যাচার। যখনই আমি সিগারেট আনতে দেব—বুড়ো কোথায় যেন ওৎ পেতে থাকে– সিঁড়ির মুখেই চাকরটাকে ধরে প্যাকেট থেকে দুটো তিনটে বার ক'রে নেবে!'

বিনয়বাবু বলেন—'কাকে বলছ ভাই! খুশী-মতো চা খাবারও জো নেই আমার। জানোই তো একটু বেশী চা না খেলে আমার চলে না—তা যতবারই আনতে দেব—কেষ্টর সঙ্গে-সঙ্গেই ঘরে ঢুকবে বুড়ো, আর রেডি একেবারে—একটি গেলাস হাতে ক'রে আসবে—কী বাবাজী, চা হচ্ছে নাকি আর একবার? তা দাও দিকিন এক ঝিনুক আমার এই গেলাসটাতে ফেলে—কী আপদ বলো দিকি?'

প্রদোষ বলে—'বুড়োকে তাড়াতে পারছেন না?'

'কী ক'রে তাড়াব বলো, তাহ'লে পুলিশ ডাকতে হয়। বুড়োমানুষ—!'

ঝড়ের বেগে ঘরে ঢোকে প্রভাত পাল,—'ম্যানেজারবাবু, আমি জানতে চাই—জবাব চাই! এ সব কি হচ্ছে আজকাল?'

বিনয়বাবু অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন,—'কি, ব্যাপার কি?'

'আমার এই তেল—' একটা ক্যাস্টর অয়েলের শিশি বার ক'রে দেখায় প্রভাত—'সবে পরশু কিনেছি, পুরো একমাস যায় আমার এক শিশি তেল—দেখুন, আজই সিকি শিশি ফরসা। এসব কি

কাণ্ড বলুন তো ?'

প্রভাতের কথা বুঝি শেষও হয় না। গলা খাঁকারি দিতে দিতে ঘরে ঢোকেন বনমালী,—'এই যে ম্যানেজারবাবু। প্রাতঃপ্রণাম। আরে, প্রভাত বাবাজী যে! হাতে ওটি কি—ও, তোমার সেই গন্ধতেলের শিশি বুঝি? খাসা তেল বাবা। আমি ক-দিন—কি বলে—তোমার ঐ তেলটাই মাখছি কি না। বেড়ে মিষ্টি গন্ধ!'

'বেশ করেছেন! আমার এদিকে শিশি ফরসা।'

'তা বাবাজী—তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে—যা দেবে না তা নষ্টই হবে। হ্যাঁ তা বলছিলুম কি ম্যানেজারবাবু, বড় একঘেয়ে খাওয়া মশাই আপনাদের। কলকাতা শহরে কি মোচা-থোড় পাওয়া যায় না? নিদেন একটু শাকের ঘণ্ট?'

প্রদোষ বেশ একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বলে—'এত কষ্ট ক'রে কলকাতায় থাকবার দরকার কি—কেটে পড়ুন না। আপনার শুভদিন তো পেরিয়ে গেছে। জামাইয়ের তো টিকি নেই।'

'ওরে বাবা, আমি কি আর শখ ক'রে পড়ে আছি? আমার সেই যাকে বলে বিটুইন টু ফায়ারস্—তাই হয়েছে। ওধারে আমার বাড়ির ওঁয়ারা, এধারে তোমরা। তুটোর মধ্যে বরং তোমরাই ভাল—নয় কি? অবশ্যি কতদিন আর চলবে, যেতেই হবে। ভাইপোদের পত্তর দিয়েছি আসতে। এলেই পরামর্শ ক'রে যা হয় করব। তাই তো ভাবছি বাবাজী, সেখানে পেঁাছলেই আবার সেই টু ফায়ারস্—একদিকে মেয়ে আর এক দিকে তার গর্ভধারিণী। সংসারের কত সুখ—এখনও তোমাদের বুঝতে দেরি আছে বাবাজী, বুঝতে দেরি আছে।'

কালীপদবাবুর ঘোড়া-রোগ আছে।

শনিবার সকাল ক'রে ফিরতে দেখেই স্ত্রী ঝেঁঝে ওঠেন।

'আবার বুঝি বেরোতে হবে ? আচ্ছা, তোমার লজ্জা করে না ?' ছেলেমেয়েগুলোর একটারও গায়ে একটা গোটা জামা নেই। ইস্কুলের মাইনে জোটে না। রোগ হ'লে হোমিওপাথির জল খাইয়ে খাইয়ে রাখো—অথচ মাঠে যাবার বেলা তো ঠিক টাকা যোগাড় হয় ? এই ক'রে যে পয়সাটা ওড়াচ্ছ এর অর্ধেকও যদি থাকত তো ছেলেমেয়েরা খেয়ে বাঁচত !'

'আরে, আমি মাঠে যাচ্ছি কে বললে ? বড়বাবুর অসুখ তাই একবার দেখতে যেতে হবে।'

'ফের মিছে কথা বলছ ! বড়বাবুর অসুখ তা এই দুপুররোদে কি ?—বেশ, সেই সন্ধ্যেবেলা যেও—'

'না, মানে এই—আমি তো একা যাবো না। আরও তো পাঁচজন আছে—বোঝ না কেন ? একটা জায়গা ঠিক করা হয়েছে, সেইখানে সবাই জড়ো হবো—কিছু ফলটল কিনে নিয়ে যেতে হবে। রুগী দেখতে যাবো বললেই তো আর যাওয়া হয় না !'

'দ্যাখো—আমি তোমাকে হাড়ে হাড়ে চিনেছি। আমাকে আর ভুলিও না। সবাই মিলে যাবে তো অফিস থেকেই তো যেতে পারতে !'

'আমি তো তাই বলেছিলুম। ঐ গন্‌শাই—'

বলতে বলতে কালীপদ বেরিয়ে আসেন।

পেছন থেকে স্ত্রী বলেন, 'তোমার ঘরকন্না এবার থেকে তুমি ক'রো। আমার যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাবো—এই ব'লে রাখলুম। আমাকে ছুঁয়ে সেদিন দিব্যি গাললে না—আর কখনও যাবে না ?'

জবাব না দিয়ে কালীপদ বেরিয়ে পড়েন।

সিঁড়ির মুখটাতেই সর্বেশ্বর।

'কী, মাঠে চললেন নাকি ?'

'হ্যাঁ—একটু মানে—ইয়ে—'

'বুঝেছি। শুনুন।' তারপর গলা নামিয়ে বলে—'লেডি লাভের উপর খুব ঝোঁক রাখবেন না। বরং কুইন অফ হেলের ওপর উইন আর প্লেস দুটোই কিছু কিছু ধরবেন।'

কালীপদবাবুর মুখ শুকিয়ে গেছে,—'তবে যে সবাই বলছে লেডি-লাভই আজ—'

'মরবেন! বেশ তো ধরতে চান ধরুন, তবে আমি যা বললুম, তাও মনে রাখবেন। সামান্য কিছু ধরেই দেখুন না!'

'আপনি এ সবের খবর রাখেন নাকি?'

'কিছু কিছু, যৎসামান্য। না রেখে উপায় কি বলুন? আমার কাকার সম্বন্ধীর সহিস হ'ল গে লাটসাহেবের বাবুর্চির আপনার মেসোমশাই!'

'তা তো বটেই। তা হ'লে বলছেন—'

'দেখুন না একটু পরখ করে। মোদ্দা লাভ হ'লে আমাকে কিছু দেবেন তো?

'নিশ্চয় দেব।···কিন্তু আপনি নিজে যান না কেন?'

'গুরুর নিষেধ আছে।' প্রশান্ত মুখে জবাব দেয় সর্বেশ্বর।

সন্ধ্যেবেলা কালীপদবাবু ফেরেন একবাক্স সন্দেশ, অসময়ের ফুলকপি ইত্যাদি নিয়ে। সর্বেশ্বর মুখ টিপে হেসে বলে,—'কী হ'ল দাদা?

কালীপদবাবু জিনিসপত্র সেইখানেই নামিয়ে ঢিপ ক'রে এক প্রণাম ক'রে বলেন—'আপনি সাধারণ মানুষ নন দাদা—মহাপুরুষ। ···যা বলেছেন তাই। লেডি লভ্ কোথায় পেছনে পড়ে রইল।'

তারপর পকেট থেকে একটা পাঁচটাকার নোট বার ক'রে সামনে রেখে বলেন—'কিছু মনে করবেন না দাদা, সামান্য প্রণামী—কিন্তু

এমনি টিপ দু-একটা দেবেন মাঝে মাঝে, একেবারে পায়ে ঠেলবেন না ছোটভাইকে।

কথাটা ছড়িয়ে পড়ে দেখতে দেখতে। সুনীলই এসে একসময় ওকে চেপে ধরে,—'হ্যাঁরে, তুই নাকি লোককে সিওর টিপ দিয়ে বেড়াচ্ছিস? তোর কাকার সম্বন্ধীর শ্বশুর নাকি কে একটা কেষ্টবিষ্টু —'

সর্বেশ্বর হাত বাড়িয়ে বলে—'একটা বিড়ি দে। কেন, তাতে হয়েছে কি?'

'—তা আমাকে দু একটা ছাড়ো না বাবা।'

'দ্যাখ্ সুনীল, ও কাজ কখনো করিস নি। মাঠে গিয়ে বড়লোক কেউ হ'তে পারে না। ও বড় সাংঘাতিক জায়গা।'

'তুই যখন এত খবর রাখিস তখন প্রাইভেট বুকির কাজও তো করতে পারিস। ওতে তো লোকসান নেই, লাভ আছে বরং।'

'ছি! জেনেশুনে মানুষের সর্বনাশ করা কি ভাল? এ পথে আনা মানেই তো তাকে পথে বসানো। আজ না হোক কাল। ও আমি করব না। নেহাৎ খুব দায়ে ঠেকলে কখনও সখনও এই সব রেসেলদের কাছ থেকে দু-এক পয়সা আদায় ক'রে নিই, এই পর্যন্ত।'

একটু ইতস্তত ক'রে সুনীল বলে—'তা তুই যার কাছ থেকে এ সব খবর পাস তার সঙ্গে আমার একটু পরিচয় করিয়ে দে না—'

'তার সঙ্গে তোর পরিচয় আছে।'

'তার মানে?'

'মানে আর কি—সত্যিই কি কেউ আছে ওরকম? ও সব আমারই ক্যালকুলেশ্যন।'

'অত নির্ভুল হিসেব হয়?'

'হয়, মাঠে না গেলে। মাঠে গেলেই সব হিসেব গুলিয়ে যায়!'

সুনীল ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না কথাটা—একটু রাগ ক'রেই চলে যায়।

'দিবি না তাই বল্। আত্মীয়-বন্ধুরা দু একটা পয়সা পায় এ কেউই বরদাস্ত করতে পারে না—তোর আর দোষ দেব কি !'

'কে র‍্যা ? কে ওখানে ?' ঈষৎ সন্দিগ্ধ, তীক্ষ্ণ শোনায় পিসীর কণ্ঠ।

'আজ্ঞে আমি শেতল গড়াই, বামুন মা।'

'ও শেতল, এসো বাবা এসো। ঐ গামছাটা বাঁচিয়ে এসো। ব'সো। তা কী মনে ক'রে ?'

'সুদটা এনেছিলুম।'

'সুদ ? তা দাও দাও, দিয়ে যাও। আমিও তো তাই বলি, মাস মাস সুদ দিয়ে গেলে আর অতটা গায়ে লাগে না। আমিও বাঁচি। বলে অবিরে বিধবা, আমারও তো কেউ আর নেই, ঐ থেকেই তো চালাতে হয়। সেই যে সেবার তুমি সুদ ফেললে—দেখলে তো, অমনি তিনমাস জমে গেল। তা সবটা এনেছ তো ?'

শেতল মাথাটা চুলকে বলে, 'সেই কথাটাই বলতে চাইছিলুম। সেবারও ইচ্ছে ক'রে ফেলি নি। দেখলেন তো ছেলেটা মরতে মরতে বেঁচে গেল। গত মাসেও নিজে পড়ে গিয়ে কটা দিন কামাই হয়ে গেল—মাইনে কাটা গেল। এমন গেরো—আবার এমাসে মেয়েটাকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি, রক্ত-আমাশা হয়ে একেবারে যতে বসেছিল। আপনি তো চোখেই দেখছেন—বানানো কথা প্রণ। নয়।'

…যা বামনপিসীর চোখ আরও সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে, 'হুঁ। তা আমাকে

তারপর কবে ?'

রেখে বলেন—নিকটা ইতস্তত করে শেতল। বার-দুই ঢোক গেলে।

বারকতক মাথা চুলকোয় তারপর মরীয়া হয়েই ব'লে ওঠে—'আমি আপনার সন্তান মা। আপনার কাছে মিছে কথা বলছি না, কোনমতে মেয়েটারই সেই দুলজোড়া বেচে দুমাসের সুদ এনেছি, এইটে নিয়ে আমায় একমাসের সুদ ছেড়ে দিন! দোহাই বামুন মা—আপনার পায়ে ধরছি। কী বিপদে পড়েছি দেখছেন তো!'

বামুনপিসী যেন ফেটে পড়েন,—'উঃ! এক মাসের সুদ ছেড়ে দিন! আবদার! কী বিপদে পড়েছি দেখছেন তো!—বলি টাকাটা যেদিন নিয়েছিলে বাছা সেদিন কী বিপদ কম ছিল কিছু? তখন কে সে-দায়ে ঠেকতে এসেছিল শুনি? সেদিন এই বজ্জাত বাম্‌নী না থাকলে কী করতে?—সেদিনকার কথা বুঝি মনে নেই? না বাপু, সুদ ছাড়তে আমি পারবো না। নিজেদেরটাই বেশ বড় ক'রে দ্যাখো, আমার চলবে কিসে ভেবেছ কোনদিন? আমার কে আছে? ভাতার না পুত না—তিনকুলে কেউ নেই। আমার ঐ পুঁজি।···ওসব হবে না—যদি ঐ মতলবে এসে থাকো তো সরে পড়ো।··হাত্তোর বেইমানের ঝাড় রে!'

মহিমবাবু এসে বসেন মাঝে মাঝে।

'আচ্ছা ভাই, আপনাকে তো বেরোতে দেখি না কখনও?'

'আমি এখন—একটু যাকে বলে বিশ্রাম করছি।'

'করেন কি আপনি?'

'করি? কি না করি বললে বরং জবাব দেওয়া সহজ হ'ত।··· অনেক কিছুই করি—মানে যখন যা পাই। ইনসিওরেন্সের দালালী, জমির দালালী, হ্যাণ্ডনোটের দালালী—হাতে দু পয়সা এলে শেয়ারের বাজারেও উঁকি মারতে আপত্তি নেই—এমনি আর কি! কেবল চাকরিটে করি না। ওটা কখনই করি নি।'

'কেন, করেন না কেন? পান নি ব'লে?'

'না, তা ঠিক নয়। ওটা আমার ধাতে সয় না। কোন-কিছু বাঁধা-ধরার মধ্যে যাওয়া আমার পোষায় না।'

'বিবাহ করেন নি ?'

'ক্ষেপেছেন ! ও তো সবচেয়ে বড় বন্ধন !'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মহিমবাবু বলেন—'বেশ আছেন। আমরাই একেবারে ন্যাঙ্গারী হয়ে মরছি।···মেয়েটার বিয়ে না দিলেই নয়—কিন্তু দিই বা কোথা থেকে। ঐ কালো কুচ্ছিত মেয়ে, তায় লেখাপড়াও শেখাতে পারি নি। কে-ই বা নেবে। টাকা তো একটা পয়সাও হাতে নেই। গতবার ছেলেটার অসুখের সময় বামুন-পিসীর কাছ থেকে পঞ্চাশটা টাকা নিয়েছিলুম, তা আজও তার একপয়সা সুদ পর্যন্ত দিতে পারি নি। পরিবারের হারছড়াই বোধ হয় যাবে !···'

সুনীল হেঁকে বললে,—'কৈগো, একটু তেল দিয়ে যাও। দেরি হয়ে যাচ্ছে। আবার তো সেই কলের জন্যে এক ঘণ্টা ধরে সাধনা করতে হবে।'

স্ত্রী এসে বললে, 'বেশী দেরি নেই। এগারো আনা পয়সা জমেছে। আর কিছু হ'লেই—মানে হাজার খানেক টাকা হাতে এলেই একটা জমি কিনবো, সর্ষের ক্ষেত। তার মাস-কতকের ভেতরেই সর্ষে ফলবে। আর তাহ'লেই তেল। তেলের তখন একটুও অভাব থাকবে না—দেখে নিও।'

সুনীল অবাক হয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে—'তার মানে ? তার মানেটা কি ? এমন একটু তেল নেই যে মাথায় দিই ?'

'ও-মাথায় তেল দিয়ে কি হবে বলতে পারো ? লাভটা কি ? দু' দিন ধরে বাড়িতে একফোঁটা তেল নেই, কাল রাত্তিরে তিন পলা ধার করেছি, আজ সকালে চার পলা। খুব কম হ'লেও চল্লিশবার

বলেছি কথাটা। তা-ই যখন ও পোড়ার মাথায় ঢুকল না, তখন সে মাথায় তেল না দিলেও চলবে।'

'সে কী কথা, আমি ভাবছিলুম ঠাট্টা করছ। সত্যিই তেল নেই?'

'হ্যাঁ। ঠাট্টা করবারই তো আমার সময় কিনা—রূপোর খাটে পা সোনার খাটে গা। কী সুখেই আছি—হাজারটা দাসীবাঁদী সেবা করছে, ঠাট্টা করা ছাড়া আর আমার কাজ কি?'

'কিন্তু পরশু যে দেড়পো তেল এনে দিলুম।'

'সে-ই মাথার গোলমাল! ওগো নবাবসাহেব—সেটা পরশু নয়, তরশুরও আগের দিন, আর দেড়পো তেল এনে কত নবাবী করবে তাই শুনি। সাত সাতটা প্রাণী গায়ে মাখে—আবার রান্না হয়। সেই বলে না—একপো দুধ এল, ক্ষীর হ'ল, ছানা হ'ল, আর কি হবে বলো না, কর্তার দুধ নইলে চলে না, ছেলেটার পায়েস না হ'লে রোচে না।···তা তোমারও দেখছি তাই!'

'না, এবার থেকে দেখছি তেল এনে শিশির গায়ে ডাক্তারী ওষুধে দাগ কাটার মতো দাগ কেটে দিতে হবে! একদিনে এক-দাগের বেশি খরচ করা চলবে না।'

'অমনি তাহ'লে আরও একটু কষ্ট ক'রো—কেমন? সেই একদাগ তেলে সংসারটা সাতদিন চালিয়ে দেখিয়ে দিও। আমি বোকাসোকা মানুষ, দেখিয়ে শুনিয়ে না দিলে কেমন ক'রে পারব বলো?'

'ঐ তো তোমাদের দোষ! হিসেবের কথা শুনলেই তোমাদের মাথায় বজ্রঘাত হয়।···মেয়েমানুষের জাতের সধম্মো!'

দুম দুম ক'রে পা ফেলে রুক্ষ চুলেই স্নান করতে যায় সুনীল।

সর্বেশ্বর বড়-একটা কোথাও বেরোয় না—দুবেলা হোটেলে খেতে যাবার সময় ছাড়া। সিঁড়ির মুখে ঐ একফালি চলনে

বিছানা পেতে ডেরা বেঁধেছে সে। সেখানেই শুয়ে শুয়ে খালি বিড়ি খায়। বিড়ির টুকরো আর ছাইতে জায়গাটা নরক হয়ে উঠেছে ক-দিনেই।

সকাল বিকেল কর্তারা এসে বসেন। বাকী সময়টা ওর কাটে টেঁপির সঙ্গে গল্প ক'রেই। টেঁপি ওর উত্তম শ্রোতা। নানা অবান্তর ও অসম্ভব আজগুবী গল্প ফাঁদে সে টেঁপির কাছে। কোন দিন হয়ত বলে—'জানিস টেঁপি, সেই যে হনোলুলুতে একটা ঘোড়ার পেটে তিনটে মানুষের ছানা হয়েছিল—তার একটা মরে গেছে।'

টেঁপি বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বলে—'ঘোড়ার পেটে মানুষের ছানা। ধ্যেৎ—তাই না কি হয়!'

'ওমা—তুই জানিস না? এ তো পুরোনো খবর রে! এই তো কদিন আগেই খবরের কাগজে খবরটা বেরিয়েছিল।'

'বেরিয়েছিল বুঝি? কে জানে বাবা! আমাদের এখানে তো কেউ খবরের কাগজ নেয় না। জানবে কি ক'রে? হ্যাঁ দাদা, সত্যি?'

'সত্যি বৈকি। আমি কি তোর সঙ্গে তামাশা করচি?'

টেঁপির চোখ বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় বিস্ফারিত হয়েই থাকে।

টেঁপিকে হাত করার একটু কারণও ছিল সর্বেশ্বরের। এখানে চাকর নেই। ফাই-ফরমাস খাটার একটা লোক চাই। সে দিক দিয়ে টেঁপি মেয়েটি ভাল। মানে সে গলির মোড়ের দোকান থেকে মধ্যে-মিশেলে বিড়ি কিনে তো দেয়ই, এক একদিন চুপি চুপি চা পাঁউরুটিও এনে দেয়।

একদিন বেলা দশটা নাগাদ পুরুষরা সবাই চলে গেল সর্বেশ্বর টেঁপিকে ডেকে বলে,—'টেঁপি এক কাপ চা খাওয়াতে পারিস? সুনীলের বৌকে দুদিন ফরমাস করেছি—আজ আবার করলে কি ভাববে?...অথচ উঠতেও ইচ্ছে করছে না।'

টেঁপি শুকনো মুখে বলে,—'আমাদের ঘরেও আজ চা বাড়ন্ত একেবারে।' তারপর একটু কি ভেবে বলে,—'আচ্ছ দেখছি—ঐ বাইরের ঘরে বুনোমোষের মতো যে দুটো ভাই থাকে, ওদের কাছে আছে কিনা।'

'সে আবার কে রে?'

'ওমা দেখেন নি আপনি? কালো কালো মোটা মোটা দুটো ভাই? ঠিক মোষ একেবারে! ওরা কোন্ খবরের কাগজের ছাপাখানায় কাজ করে। সারারাত কাজ—সারাদিন পড়ে ঘুমোয়। ওদের ঘরে যদি চা থাকে তো আমি এনে দিচ্ছি। লোক ভাল ওরা, যখন যা চাই তাই দেয়। অথচ কারুর সাতে-পাঁচে থাকে না।'

নিচের সেই দুই-ভাইয়ের ঘরে গিয়ে টেঁপি উঁকি মারে—

এক ভাই বসে কুটনো কুটছে, স্টোভে রান্না চড়েছে।

খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে ওঠে টেঁপি।

'হাসছ কেন?—অমন পাগলের মতো!'

মুখে কাপড় দিয়ে হাসি সামলে নিয়ে টেঁপি বলে,—'বেশ গিন্নী-বান্নীর মতো রান্না করেন আপনারা। দেখলেই হাসি পায়!'

'আমাদের কেউ নেই—তাই করতে হয়। অত যদি অসহ্য লাগে—এসে ক'রে দিয়ে গেলেই তো পারো।' ছোট ভাইটা হেসে বলে।

'আমার সময় থাকলে ঠিক ক'রে দিয়ে যেতুম, মাইরি বলছি!'

টেঁপির সুরটা আন্তরিকই শোনায়।

আর এক ভাই রাস্তার কল থেকে জল নিয়ে এসে ঢুকল।

'আচ্ছা, আপনারাও তো ভাড়া দেন, কিন্তু সব জল রাস্তা থেকে তোলেন কেন—এত কষ্ট ক'রে?'

'কী করব। ঐ ঝগড়া ক্যাচাকেচির চেয়ে এ ঢের ভাল। ওসব আমাদের পোষায় না।'

টেঁপি বলে, 'তা বটে। আচ্ছা—একটু চা পাতা হবে আপনাদের কাছে ?'

'হবে—কেন বলো তো ?'

'একটু দিন না। এক কাপের মতো।'

'ঐ টিনটায় আছে, নিয়ে যাও।'

ওদের ঘর থেকেই একটু কাগজ সংগ্রহ করে টেঁপি গিয়ে টিনটা থেকে প্রয়োজন-মতো চা ঢেলে নেয়।

তারপর দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত ক'রে বলে—'আর কি হবে ? মাছের ঝোল ? তা মাছ কৈ ? এখনও জলেতে নাকি ?'

তারপরই নজরে পড়ে যায় বাজারের থলিটা মাছসুদ্ধ এক পাশে পড়ে আছে। সে গালে হাত দিয়ে বলে···'ও মা, এ মাছ যে পচে উঠল। এখনও তো বাছাও হয় নি দেখছি। আচ্ছা দাঁড়ান, মাছ-গুলো আমি বেছে কুটে দিয়ে যাচ্ছি। ঐ বুঝি আঁশ-বঁটি ?'

'আহা, তুমি আবার কেন করবে, আমরাই ক'রে নিচ্ছি—'

'করলুমই বা। আপনাদের করতে আধঘণ্টা, আমার পাঁচ মিনিট। কেটে দিয়ে যাচ্ছি, ধুয়ে তাড়াতাড়ি নুন-হলুদ মাখিয়ে রাখুন, নইলে ওর আর আদায় থাকবে না।'

ওখান থেকে ফিরে একটু পরেই চা তৈরি ক'রে আনে টেঁপি। সর্বেশ্বর পুরস্কার স্বরূপ নতুন একটা গল্প শোনায়। বলে,—'উড়ো-জাহাজ হয়ে আজকাল কী সুবিধেই হয়েছে বলত টেঁপি। বিলেতের রাজা রোজ কামস্কাটকায় মাছ ধরে বাড়ি ফেরার পথে বসোরা থেকে গোলাপ কিনে নিয়ে যায়।···আগে এসব কথা কেউ ভাবতেই পারত না।'

'তাই নাকি ? বেশ মজা তো!' চোখ বড় বড় ক'রে বলে টেঁপি। তারপর বলে,—'জানেন দাদা, আপনি সে দিন যে খবরটা দিলেন না—বাবাকে বলতে হেসে উড়িয়েই দিলে। বলে তুই

যেমন বোকা—তোকে তেমনি বোকা বোঝায় মুখুজ্যে !'

'কোন্ খবরটা রে ?' চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে প্রশ্ন করে সর্বেশ্বর।

'সেই যে—বোম্বেতে সেদিন ভূমিকম্প হয়ে সেই সমুদ্দুরের মাছ ছিটকে এসে লাট সাহেবের খাবার টেবিলে পড়েছিল।···সত্যি নয় কথাটা ?'

'সত্যি বইকি। নইলে তোকে বলব কেন ? তোর বাবা তো খবরের কাগজ পড়তে পায় না। খবর জানবে কি ক'রে বল্ ?'

টেঁপির চোখ ছলছল করতে থাকে। সে বলে—'আর খবরের কাগজ—খেতেই জোটে না। ওসব খরচ করবে কোথা থেকে ? বামুন পিসির কাছে গয়না বাঁধা আছে, তবু কাল ডেকে একরাশ কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছে। বাবা কাল ঘরে ফিরে চোখের জল ফেলছিল।'

সর্বেশ্বর খানিকটা চুপ ক'রে থাকে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে জামাটা টেনে নিয়ে গায়ে দিতে দিতে বলে—'আমি এখন বেরুচ্ছি টেঁপি। তোর বাবা ফিরলে বলিস তো, রাত্তির বেলা যেন আমার সঙ্গে দেখা করে।'

রাত্রে মহিমবাবু এসে ওর বিছানারই একটা পাশ ঝেড়ে-ঝুড়ে নিয়ে বসলেন।

'আমাকে ডেকেছিলেন ?'

'হ্যাঁ—একটা কথা ছিল। আচ্ছা, বামুন পিসির কাছে আপনার কত দেনা ?'

'তা ঠিক বলতে পারব না। তবে নব্বুই টাকার কাছাকাছি হবে।'

বালিশের তলা থেকে একখানা একশ টাকার নোট বার ক'রে

ওর হাতে দিয়ে সর্বেশ্বর বলে—'ওর দেনাটা মিটিয়ে দিয়ে আসুন দিকি—যান।'

কথাটা বুঝতে মহিমবাবুর কিছু বিলম্ব হয়। শেষে তিনি প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায় বলেন—'টাকাটা আপনিই ধার দেবেন? বাঁচালেন দাদা। কাল বুড়িটা কী যাচ্ছেতাই করলে আমাকে! আমাকে বলে কিনা সোনার দামের চেয়ে তার বেশী পাওনা হয়ে গেছে। আপনাকে আমি সত্যিই বলছি দাদা—আপনি ঠকবেন না। সরু হার বটে তবে দেড় ভরির বেশী ছিল ওজন, ক-দিনই বা গলায় দিয়েছে টেঁপির মা যে ক্ষইবে?'

নোটটা হাতে নিয়ে মহিমবাবু বামুন পিসির ঘরের সামনে দাঁড়ান—'পিসিমা ঘরে আছেন নাকি?'

'কে মহিম? এসো বাবা—এসো। দেখো, আমার ঐ গামছাখানা বাঁচিয়ে। আধ-শুক্‌নো হয়ে গেছে কিনা। তোমাদের পথঘাটের কাপড়—তা ব'সো বাবা, ঐ যে চটের আসনটা—টেনে নাও।' পিসিমা জপ করছিলেন। জপের মালাটা কপালে ঠেকিয়ে গলায় পরে নিলেন।—'তারপর কি মনে ক'রে বাবা মহিম?'

'সেই হারটা পিসিমা। দেখুন তো একবার সুদটা কষে, কত দাঁড়িয়েছে?'

'অ—তা বাবা সব সুদটা তো আর এখন দেবে না। কেন আবার এই বুড়ো-মানুষকে খাটাবে এত রাত্তিরে? যা দেবার দিয়ে যাও না। আমি কাল সকালে জমা ক'রে রাখব'খন।'

'না—আমি—আমি ও হারটা নিয়ে যাবো পিসিমা।'

'নিয়ে যাবে? সব টাকা দিয়ে!' তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে পিসিমার কণ্ঠস্বর, 'কিন্তু সে যে একগাদা টাকা মহিম। সুদ আমি এক পয়সাও ছাড়তে পারব না, তা আমি ব'লে দিচ্ছি। আমার তো

স্বামী-পুত্তুর নেই যে রোজগার ক'রে খাওয়াবে? বিধবা বেওয়া মানুষ, আমার ঐ সুদই ভরসা।'

'না না পিসিমা—সুদ আমি ছাড়তে বলছি না। আপনি হিসেবটা দেখুন না?'

'হুঁ—তাহ'লে টাকা হয়েছে বাবুর? তা টাকাটা কে দিলে তাই শুনি?'

'সে পরে বলব পিসিমা। আপনি খাতাটা দেখুন আগে।'

'দেখছি বাছা, দেখছি। তোমার এখন ফুর্তির প্রাণ ঘোড়দৌড়ের মতো দৌড়চ্ছে, আমার তো আর তা নয় বাছা, বুড়ো মানুষ, বাতের শরীর!···যত সব অনাছিষ্টি কাণ্ড! দিন গেল আলোয় ঝালোয়—রাতদুপুরে উনি এলেন আমাকে পয়সার গরম দেখাতে।' পিসিমা গজগজ করতে করতে ওঠেন। কুলুঙ্গীর কোণ থেকে শ্লেট, পেন্সিল আর খাতা বার ক'রে হিসাব করতে বসেন।

হিসেব নিকেশ ক'রে সব চুকিয়ে দিয়ে হার নিয়ে ফিরে আসেন মহিমবাবু।

'বাঁচালেন ভাই। ঐ ডাইনী বুড়ীর হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে বাঁচলুম। হারটা যত্ন ক'রে তুলে রাখুন।'

'হার নিয়ে আমি কি করব?'

'হার—হার আপনি রাখবেন না!'

'পাগল হয়েছেন? এই তো হাল দেখছেন। সোনাদানা রাখব কোথায়?'

'তবে টাকাটা কি শুধু হাতে ধার দেবেন! সুদ কত নেবেন তাহ'লে?' কণ্ঠে আশঙ্কার সুর মহিমবাবুর।

'টাকা ধার দেওয়া কি আমার ব্যবসা?'

'তবে।' মহিমবাবু আরও বিস্মিত হন।'

'ওটা আমি টেঁপির বিয়েতে যৌতুক দিলুম আগাম

'না না ভাই, সে হয় না। কদিনেরই বা জানাশুনো ? এতগুলো টাকা—।'

'তা হ'লে হারটা আবার বামুন পিসিকে দিয়ে টাকাটা ফিরিয়ে আনুন।'

সর্বেশ্বর বেশ প্রশান্তকণ্ঠেই কথা কটা বলে।

মহিমবাবু আরও কুণ্ঠিত হয়ে পড়েন। একটু চুপ ক'রে থেকে গাঢ় কণ্ঠে বলেন—'কালীপদ ঠিক কথাই বলে, আপনি কোন ছদ্মবেশী মহাপুরুষ।' তারপরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন—'কবে যে ওর বিয়ে দিতে পারব তাই তো ভাবি। হাতে একটা পয়সাও নেই। শুধু হাতে কে-ই বা বিয়ে করবে বলুন ? রূপও নেই, আর রুপোও নেই। অথচ, মাইরি বলছি ভাই, বড় ভাল মেয়ে ও। বড় ঠাণ্ডা আর গুণের মেয়ে। মারো ধরো কাটো, একটা কথাও কইবে না।'

'হবে—হবে। হয়ে যাবে—ভাববেন না। দেখুন এ সংসারে যার মনটা ভাল তার কখনও অকল্যাণ হয় না। শেষ অবধি ভাল পাত্রেই পড়বে।'

'আর ভাল পাত্তর।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে মহিমবাবু উঠে যান।

একটু পরেই টেঁপি আসে ছুটতে ছুটতে।

'একটু মাথাটা তুলুন তো—ও দাদা।'

'কেন রে ?' বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে সর্বেশ্বর।

'মাথাটা তুলুন না।'

সর্বেশ্বর উঠে বসতেই দু-হাত দিয়ে ওর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে টেঁপি।

'ওকি—ওকি। ওটা আবার কি হ'ল ?'

'আপনি নাকি এই হারটা যৌতুক দিয়েছেন আমাকে ? বাবা

আমাকে পরতে বললে। বাবা বলছেল আপনি মানুষ নয়—দেবতা। আজ বুঝেছে বাবা। এতদিন আমি আপনার সুখ্যাতি করলে আমাকে ঠাট্টা করত।…আমার খুব আনন্দ হয়েছে—সত্যি!'

কতকটা অসংলগ্নভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে কথাগুলো।

'কেন—হার পরে?'

'না, তা নয় দাদা। আপনাকে যে বাবা-মা এতদিনে চিনতে পেরেছে এইজন্যে।'

'আচ্ছা আচ্ছা—হয়েছে! আর পাকামি করতে হবে না, যা এখন!'

সর্বেশ্বর প্রয়োজন হ'লে যেমন ভোরে উঠতে পারে তেমনি অবসর পেলে অনায়াসে নটা অবধি ঘুমোতেও পারে। এখানে এসে অবসরের অভাব নেই, কিন্তু ঘুমও হ'তে পারত না! একবাড়ি লোক—দুটি কল—শুধু জল নেবার কচ্‌কচিতেই ঘুম ভেঙে যেত। কাজ নেই ব'লে ওঠবার চেষ্টা করত না—শুয়ে শুয়ে নিঃশব্দে বিড়ি টানত। আজ কিন্তু একটু বেশী আগেই ঘুম ভাঙল। খনখন ক'রে বেজে উঠল বামুন পিসীর কণ্ঠস্বর,—'বলি মেয়েটিকে কী দরে বেচলে বাবা মহিম?'

'তা—তার মানে? কী বলছেন আপনি?'

'না, তাই বলছি। বলি ঘাস তো খাই না বাবা—ধানের চালের ভাতই খাই। কোথা থেকে টাকা নিয়ে হারছড়া ছাড়ালে তা কি আর আমি জানি নে বাবা। এই বাজারে কেউ একটা টাকা বার করতে পারে না পকেট থেকে, আর ওর তো ঐ অবস্থা! অন্তভক্ষো ধনুর্গুণো—মড়ার চ্যাকড়া পেতে শুয়ে আছে রাতদিন, আর ফুকফুক ক'রে বিড়ি টানছে। কুড়ি টাকা মাইনের চাকরিও নেই।

ও অমনি যে ফস ক'রে এক আঁজলা টাকা বার ক'রে দিলে—সে কি শুধু শুধু! তার দাম দিতে হয় নি?'

'এ সব কি বলছেন বামুনপিসি। অমন কথা মুখে উচ্চারণ করবেন না। টাকাটা উনি দিয়েছেন সে তো আমি সবাইকেই বলেছি। উনি মানুষ নন, দেবতা। টাকাটা উনি আমার টেঁপিকে যৌতুক করেছেন।'

'যৌতুক করেছেন! তাই তো বলছি! কী এমন শুভদিন—ওর বে-থা হ'ল যে যৌতুক করলেন?···তখনই বলেছিলুম পেরতাপকে যে অমন কাজ করো নি। একটা হাড়হাবাতে বাউণ্ডুলে বিশ্ববকাটে লোককে এতগুলো মেয়েছেলেপিলের মধ্যে ঢুকিও নি। তা আমার কথা তো শুনলে না। এখন ঠেলা সামলাক্। তবে আমিও ব'লে রাখলুম—এই মানি বামনী থাকতে ও সব বেলেল্লাগিরি চলবে না এখানে। ভালয় ভালয় যদি না যায় তো কি ক'রে বিদেয় করতে হয় তা আমি দেখিয়ে দেব। মুড়িখ্যাংরা মারতে মারতে বার করব বাড়ি থেকে!'

মহিমবাবু মুখখানা এতটুক ক'রে ওপরে উঠে আসেন। সর্বেশ্বরের সঙ্গে চোখোচোখি হ'তেই বলেন,—'শুনলেন—শুনলেন তো ভাই মাগীর কথাগুলো?···ছি ছি! ও নাকি আবার বামুনের মেয়ে!'

সর্বেশ্বর হেসে জবাব দেয়—'সুদে আসলে হারটা মেরে দেবে এই ভেবেই আপনাকে তাগাদা করেছিল, টাকার দরকারে নয়। সে আশায় ছাই পড়ল, ক্ষেপে তো একটু উঠবেই। ও নিয়ে আর মাথা খারাপ করছেন কেন?'

'আপনি এ বাড়িটিকে চেনেন না—এই নিয়ে যা ঘোঁট হবে!'

'মিথ্যে চিরদিনই মিথ্যে। ওর অত দাম দিতে গেলে এ পৃথিবীতে বাঁচা যায় না।'

'—না ভাই। কাদা ছোঁড়ার কারণটা হয়ত মিছে হ'তে পারে কিন্তু কাদাটা সত্যি—তা গায়ে লাগলে ধুতে হয়।'

'ধুয়ে ফেললেই যা চলে যায় তার জন্যে অত ভয় কি!' প্রশান্তভাবে হাসে সর্বেশ্বর।

কথাটা কিন্তু সত্যিই ঐখানে মেটে না।

বিকেলে কলতলাতে একেবারে রণরঙ্গিণী বেশে আবির্ভূতা হন বামুন-পিসী।

'বলি, হ্যাঁ লা, তোরা তো বেশ! তোরাও তো সব সোমত্ত সোমত্ত মেয়ে নিয়ে বাস করিস। তোদের একটু প্রাণের ভয় নেই? এমনি রাসলীলা চলবে আর তোরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবি? এর পর তোদের মেয়ের বে দিবি কেমন ক'রে? পাত্তর্ জুটবে?'

দু-একজন চোখে চোখে চেয়ে মুচ্‌কি হাসল। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী যারা, তারা সরে পড়ল। বামুন-পিসীর মুখ কে না জানে। এখনই হয়ত নানা কল্পিত কেচ্ছার ইতিহাসে আকাশ-বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠবে।

কিন্তু যাদের জল নিতেই হবে, তারা পালায় কি ক'রে? বিশেষতঃ সুনীল চাক্‌লাদারের বৌ তখন সবে ঘড়া বসিয়েছে। বামুন-পিসী সকলের দিকে একবার অগ্নিদৃষ্টিতে চেয়ে তাকে নিয়েই পড়লেন, 'বলি তপুর মা, তোমার তো কি রকম আত্মীয় হয় শুনেছি ছোঁড়া—তুমি কি বলো? এমনি চলবে?'

সুনীলের বৌ মাথার ঘোমটাটা একটু নামিয়ে নতমুখে জবাব দেয়—'আমার কিসের আত্মীয় পিসীমা? ওঁর বন্ধু। তা ছাড়া ওসব কথার আমি কিছু জানি নে, ও কথায় থাকতেও চাই নে!'

'তা জানবে কেন?...তোমরাও বুঝি ঐ চাও? বেশ মজা, না! ...তা তুমিই বা বাকী থাকো কেন তপুর মা? দু-পয়সা কামিয়ে

নাও না!···তোমার আত্মীয় ব'লেই তো পেরতাপ ঐ আপদ বাড়ি ঢুকিয়েছিল গা!'

তপুর মা'র উদ্যত রসনা জবাব দিতে গিয়েও থেমে যায়। আজই হয়ত সন্ধ্যাবেলা গিয়ে দুটো টাকার জন্যে হাত পাততে হবে—ছোট ছেলেটার অসুখে হাত খালি হয়ে গেছে, টাকা না পেলে হাঁড়ি চড়বে না। শুধু হাতে দু-এক টাকা মেলে মাঝে মাঝে, হোক্ টাকাপ্রতি ছ' পয়সা মাসিক সুদ—তাই বা দেয় কে? সে ক্ষীণস্বরে শুধু বললে, 'আপনাদের যা করবার করুন না পিসীমা, আমরা গরীব মরেই আছি, আমাদের আর বেশী ক'রে মেরে লাভ কি? আপনি তো জানতেনই ও আমাদের কেউ হয় না—সে খোঁটা এখন দেন কেন?'

'আমি তো জানতুমই। কিন্তু কৈ তোমরা তো তখন একটা কথাও বলো নি!···আমি যা করতে পারি তা তো করবই। পেরতাপ দত্ত যদি এর একটা প্রিতিকার না করে তো ওকে সুদ্ধু ভিটেছাড়া করব—এই ব'লে রাখছি।'

কথাগুলো প্রতাপ দত্তের ঘরের দিকে মুখ ক'রেই বলা হয়। ছোট জায়গা, শোনবার কোন বাধা নেই। তবু আর এক পর্দা গলা চড়িয়ে বলেন, 'কালই যদি এর সুরাহা না হয় তো ঐ পেরতাপের ঘরের সামনে উপোস ক'রে তে-রাত্তির শুরু ক'রে দেব, এই ব'লে রাখলুম। দেখি ছেলেপুলে নিয়ে বাস ক'রে কোন্ সাহসে চুপ ক'রে থাকে।'

তিনি দুম্ দুম্ ক'রে পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে ঝনাৎ ক'রে কলতলায় বালতিটা বসান।

সন্ধ্যের সময় মহিমবাবু এসে হতাশ ভাবে বসে পড়েন ওর বিছানায়।

'আপনাকে বলেছিলুম মুখুজ্যে মশাই আপনি বিশ্বাস করেন নি। আজ সন্ধ্যের সময় প্রতাপ দত্ত আমাকে শাসিয়ে গেল যে হয় মেয়ের বে দিতে হবে, নয়ত উঠে যেতে হবে এক মাসের মধ্যে।'

সর্বেশ্বর চুপ ক'রে বসে বিড়ি খাচ্ছিল—তেমনিই বসে রইল।

মহিমবাবু ব'লে চললেন, 'কোথায় এখন রাতারাতি পাত্তর পাই বলুন তো! আর বাসাই বা কোথায় পাই।'

'তার দরকার হবে না মহিমবাবু—আমিই কাল সকালে চলে যাব।'

'না না ভাই—ছি! আমার জন্যে আপনি কেন যাবেন? তাহ'লে তো পরোপকারের খুব ফল মিলল!'

'আবার পরোপকারের কথা কেন তুলছেন চক্কোত্তি মশাই? টেঁপিকে স্নেহ করি—ওকে একটা কিছু দেবার কথা ভাবছিলুম—কিনে না দিয়ে না হয় ঐটেই ছাড়িয়ে দিলুম!'

'সেই কথাটাই বলব ভাবছিলুম ভাই—সাহসে কুলোচ্ছিল না। তা অভয় দিলে যখন বলি—তুমিই বলছি ভাই কিছু মনে ক'রো না, তুমি আমার চাইতে বয়সে ছোটই হবে—তুমি যখন টেঁপিকে স্নেহই করো, তুমিই নাও না কেন ওকে?'

'ওকে নেব—মানে?'

'মানে—তুমিই ওকে বিয়ে করো না।'

'না! এদের দেখছি সক্কলকার মাথা খারাপ হয়ে গেছে! আমার সঙ্গে দেবে মেয়ের বিয়ে! তার চেয়ে এক কাজ করো না কেন চক্কোত্তি—খুব ভোর ভোর উঠে মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে হাওড়ার পোলের ওপর থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে এসো।'

'কেন ভাই? মেয়ের আমার তেমন রূপ নেই, কিন্তু বড় লক্ষ্মী আর ঠাণ্ডা মেয়ে।'

'তাই বুঝি একটা লক্ষ্মীছাড়ার হাতে না দেওয়া পর্যন্ত শান্তি হচ্ছে না।'

'না না, লক্ষ্মীছাড়া তো তুমি নও; সে আমি বুঝে নিয়েছি। কেউ নেই ব'লে এমন ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছ। তুমি ওকে নিয়ে সংসার পাতো ভাই, সুখীই হবে।'

'ত্যাখো চক্কোত্তি! একটা কথা সাফ ব'লে দিচ্ছি—বিশ্বাস করো আর না-ই করো। বিয়ের ভয়েই আমি এখানে পালিয়ে ঘাপ্‌টি মেরে আছি। যেখানে আমি থাকতুম সেখানে এক ব্যাটা হবু শ্বশুর আমাকে তাড়া করেছে! তুমি যদি আবার এই কথা তোল, তাহ'লে আমাকে এই রাত্তিরেই সরে পড়তে হয়। না হয় রাতটা কোন পার্কে কি ওয়েটিং রুমে কাটিয়ে দেব!'

'না না, তা বলছি না।' অপ্রতিভ হয়ে পড়েন মহিমবাবু, 'মেয়েটাও তোমাকে বড় ভক্তি করে। তোমার নাম করতে অজ্ঞান একেবারে। কোথায় কার হাতে দেব—মোদো মাতাল কিংবা জুয়াড়ি—বিড়িওলা কি গাড়োয়ান—কেঁদে কেঁদে জীবনটা যাবে। অথচ আমার যা অবস্থা, ওর চেয়ে ভাল পাত্তর আর কি জুটবে বলো!'

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে লাফিয়ে ওঠে সর্বেশ্বর, 'হয়েছে। ঠিক হয়েছে। পাত্তর আছে চক্কোত্তি। তোমাদেরই বাড়ির নিচে বাইরের ঘরে ঐ যে ছেলে দুটি থাকে,—কোন খবরের কাগজে কাজ করে যেন,—ওদেরই বড়টির সঙ্গে লাগিয়ে দাও। বেশ ছেলে, ওরাও টেঁপিকে খুব স্নেহ করে।'

'ওরা? হ্যাঁ—ওরা বামুন বটে। কিন্তু ওরা কি রাজী হবে একেবারে, শুধু-হাতে নিতে?'

'তুমি কথাটা পাড়োই না—যাও ওঠো। আচ্ছা সে সামান্য দু'চার টাকার জন্যে আটকায়—আমি যেমন ক'রে পারি যোগাড়

ক'রে দেব!···আমি যদি না থাকি তো তাও ভেবো না—বিয়ের তারিখের আগে আমি পাঠিয়ে দেব। বিয়ের আগে আমার মেসের ঠিকানায় একটা চিঠি দিও। যাও।'

প্রায়-অনিচ্ছুক মহিমকে একরকম ঠেলেই পাঠায় নিচে সর্বেশ্বর।

তারপর অনেকক্ষণ পর্যন্ত অন্ধকারেই বসে বসে বিড়ি টানে সে। খানিকটা পরে ওর চোখে পড়ে টেঁপি নিচে থেকে কী একটা কিনে নিয়ে আসছে।

'এই টেঁপি শোন্।'

—'কী দাদা?'

—'বোস্ এখানে!···একটা কথা—আমি কালই এখান থেকে চলে যাচ্ছি!'

'সে কি!' চমকে ওঠে টেঁপি, চিনি কিনে ফিরছিল, হাত থেকে ঠোঙাটা পড়ে গিয়ে চারিদিকে চিনি ছড়িয়ে যায়। কিন্তু সেগুলো তুলতেও যেন ওর হাত-পা আসে না। সর্বেশ্বর নিজেই উঠে এসে কুড়োতে শুরু করে।

'আবার কবে আসবেন?'

'আবার আসব কী রে। একেবারেই চলে যাবো। আমার তো বাসা একটা আছে; সেখানে একটু গোলমাল ছিল ব'লেই দু-চার দিনের জন্য এখানে এসেছিলুম।'

'সেখানে কে কে আছে?' কেমন একরকম ধরাগলায় বলে টেঁপি।

'কে আবার থাকবে। সে যে মেস।···ঠাকুর চাকর—এই সব আছে।'

'আপনার বাড়ি নেই কোথাও?'

'না।'

টেঁপি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ।

'আপনি একটা বাসা কেন করেন না কোথাও?'

'ও আমার ভাল লাগে না টেঁপি।'

'চিরদিন এমনি কাটাবেন? যদি কখনও অসুখ-বিসুখ করে? কে দেখবে।'

'ভগবান দেখবেন। হাসপাতাল আছে! ওসব বাজে ভাবনা নিয়ে আমি থাকি না।'

'আপনি—আপনি বিয়ে-থা করবেন না!'

'আবার তোর মুখেও ঐ কথা? দেখছি আমাকে রাতটাও কাটাতে দিবি না। বললুম না যে ওসব আমার ধাতে সয় না।'

টেঁপির মার ডাক কানে এল,—'হ্যাঁরে টেঁপি এলি!' তারপর ঈষৎ নিচু গলায়,—'হতচ্ছাড়া মেয়ের লজ্জা নেই—আবার ঐখানে গিয়ে জুটেছে—'

'যা টেঁপি—মা রাগ করছেন। সর্বেশ্বর দাঁড়িয়ে ওর হাতে চিনির ঠোঙাটা তুলে দেয়। আড়ষ্টভাবেই সেটা হাতে ক'রে নেয় টেঁপি। চারপাশের আলোর আভাতে সর্বেশ্বর লক্ষ্য করে—টেঁপির চোখে জল।

'দূর পাগলী, কাঁদছিস কেন? আমি আবার আসব। তোর বাবাকে বলেছি বিয়ের সম্বন্ধ করতে—বোধ হয় হয়ে যাবে।··· তোর বিয়েতে নিশ্চয় আসব। যা ভাই, লক্ষ্মীটি যা—'

টেঁপির চোখ বেয়ে এবার অজস্র ধারে জল গড়িয়ে পড়ল। ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল থর থর ক'রে। কিন্তু সে কোন উত্তর দিলে না, নিঃশব্দেই নিজেদের ঘরের দিকে চলে গেল।

সর্বেশ্বরের মুখটা অন্ধকারে ভাল দেখা গেল না। সে তেমনি খানিকটা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে আবার নিজের বিছানায় বসে পড়ল। তারপর একটা বিড়ি ধরাতে ধরাতে অস্ফুটকণ্ঠে বললে—'কঠিন মায়া বাবা।'

পরের দিন ভোর বেলাই উঠে বিছানাটা গুটিয়ে একপাশে সরিয়ে রেখে সর্বেশ্বর নিচে নেমে এল। কল থেকে এক খবলা জল নিয়ে মুখে চোখে দিয়ে বাড়িওলার ঘরের সামনে দাঁড়াল।

'দত্তমশাই উঠেছেন নাকি!'

'--কে?' বলতে বলতে পাঁচহাতি ধুতি-পরা প্রতাপবাবু বেরিয়ে এলেন।

'আরে, আপনি—এত ভোরে!'

'আমি আজই চলে যাচ্ছি প্রতাপবাবু, সেই কথাটা বলতে এলুম।'

'সে কি? কোথায় যাচ্ছেন? কবে ফিরবেন?'

'যাচ্ছি দেশে। কবে ফিরব তা বলতে পারি না। আপনি জায়গাটা ভাড়া দিতে চান, কাউকে দিয়ে দেবেন। আমার এখনও দিন-পনেরো বাকি আছে—তা ওটার টাকা আর আমি ফেরত চাই না—একটা নোটিশ দিতেও তো হ'ত!'

'তা—হঠাৎ এমন ভাবে—'

'মানে ঐ খবরটা শুনলুম কিনা। আমিই এমন ক'রে বেড়াই, কিন্তু আমার পিসিমার হাতে এখনও সোনাদানা আছে ঢের। তাই ভাবছি—তাঁকে একটা সংবাদ দেওয়া তো উচিত! বিধবা মানুষ, ঐ তো ভরসা। স্নেহ করেন খুব—তার একটা ঋণও আছে, তিনি তো খবর পান না কিছু, আমার একটা খবর দেওয়া কর্তব্যও।'

'কী খবর মশাই। সোনাদানা, মানে—কোন বিশেষ খবর আছে নাকি?'

'কেন, আপনি শোনেন নি কিছু?'

'কৈ না তো! কি শুনব!'

গলাটা একটু চড়িয়েই উত্তর দেয় সর্বেশ্বর—'কোম্পানি যে সোনার দাম বেঁধে দিচ্ছে।'

'সে আবার কি ? কত ?' প্রতাপবাবুর মুখ শুকিয়ে ওঠে।

বামুনপিসি কলতলায় স্নান করতে নেমেছিলেন। তিনিও কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে যান।

'সোনার দাম হু হু ক'রে বেড়ে যাচ্ছে ব'লে ব্যবসা-বাণিজ্যের বড় ক্ষতি হচ্ছিল। তাই কোম্পানি আইন করছে যে কেউ আর পঞ্চাশ টাকা ভরির বেশি বেচতে পারবে না।'

'যাঃ—কী বলেন !' প্রতাপবাবুর মুখ দিয়ে কোনমতে কথাটা বের হয়। তাঁর মুখে হাসির আভাস কিন্তু চোখে উদ্বেগ ও হতাশা। হাসি-কান্নায় মেশানো মুখভাব।

—'বেশ তো, অমনি নিশ্চিন্তি থাকুন না ! দুদিন পরেই খবরের কাগজে দেখতে পাবেন।'

—'আপনি—আপনি কথাটা শুনলেন কোথায় ?'

'আপনি তো জানেন—আমার কাকার নিজের সম্বন্ধীর সহিস হ'ল গে লাটসাহেবের বাবুর্চির আপনার মেসোমশাই ! বলি আইনকানুন যাই হোক না কেন—লাটসাহেবের কানে তো আগে পৌঁছবে !'

যুক্তি অকাট্য। প্রতাপবাবুর পা-দুটো থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল। তিনি সেইখানেই বসে পড়লেন। বামুনপিসিরও আর স্নান করা হ'ল না, তিনি উঠে এসে সেই সংকীর্ণ রোয়াকেই আছড়ে পড়লেন,—'ওমা, কী সর্বনেশে কথা রে ! আমি যে দাঁড়িয়ে মারা যাবো রে। ওরে আমার যে মূলধনসুদ্ধ চলে যাবে রে !'

'কী করা যাবে মাসিমা বলুন—ওধারে যে অনেক লোকের সর্বনাশ হয়ে যায়। আপনার মতো দুচার জনের ক্ষতি হয়েও যদি গরীব লোকদের সুবিধে হয়—কোম্পানি তো সেইটে আগে দেখবে কিনা ! তবে আপনার অত ভাবনাই বা কি, এখনও তো খুব একটা খবর ছড়ায় নি, যতটা পারেন বেচে দিন না এই বেলা !'

সে আর দাঁড়াল না, নিস্পৃহ উদাসীন ভাবে গুণ গুণ ক'রে গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে গেল—

'মা আমায় ঘুরাবি কত—চোখঢাকা বলদের মতো।'

বামুনপিসি ততক্ষণে মড়াকান্না জুড়ে দিয়েছেন।

॥ ৮ ॥

সর্বেশ্বর ভয়ে ভয়েই মেসে ফিরছিল। বরাতক্রমে গলির মুখেই ঠাকুরের সঙ্গে দেখা—আর তার মুখে ভাল খবরই পাওয়া গেল। সে একগাল হেসে বললে—'আপনার শ্বশুর মশাই চলে গেছেন আজ্ঞা। সবে পরশু গেছেন—মিলচার্জ বাদে চা পান তামাক আর জলখাবারে কদিন বিল হয়েছে আপনার বিয়াল্লিশ টাকা দশ আনা।'

'তা হোক্ গে—আপদ গেছে তো।'

'আজ্ঞা হ্যাঁ, গেছেন। তবে আবার আসবেন।'

'আবার আসবেন? সে কী রে?'

'আজ্ঞা। এবার আপনার পিসিমাকে সুদ্ধ নাকি নিয়ে আসবেন! তা ছাড়া দুজন ভাইপোকে রেখে গেছেন, তারা সারাদিন হাওড়া আর শিয়ালদায় পাহারা দেবে।'

সর্বেশ্বর শিউরে ওঠে, 'বলিস কিরে! এ যে নাগপাশ বাবা —অনন্ত সাপের পাশ! পাশ ফেরবার যো নেই!'

'আজ্ঞা! এ মাস না হ'লে নাকি দু'মাস টাইম নেই। কী করা যাবে। খুব জরুরি দরকার ওঁয়াদের!'

'হুঁ!' মেসে ঢোকে সর্বেশ্বর খুব বিষণ্ণচিত্তেই। খবর আরো যা মেলে তাতে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। প্রদোষ এসে বলে,

'মুখুজ্জেদা কেন পালিয়েছিলেন তা ঐ মালটি দেখেই বুঝেছি। বাব্বা, শ্বশুর বটে একখানা!···শ্বশুরই এই—না জানি ওঁয়ার কন্যাটি কেমন!'

বিনয়বাবু রাগ ক'রে বল্লেন,—'না মশাই। আপনাকে সহ্য করি এই ঢের। আপনার ও রকম গেস্ট এলে আর পারব না। দিয়ে যাবেন ষাটটি টাকা!'

'দিয়ে যাবেন ষাটটি টাকা!' ভেংচি কেটে বলে সর্বেশ্বর,—'আমার সঙ্গে আগে পরামর্শ করেছিলেন? আমি কি বলেছিলুম খাওয়াতে? দেখলেন আমিই পালালুম—আপনারা কোন্ আক্কেলে খাওয়াতে গেলেন?'

'কে জানে মশাই—সত্যিই যদি কোন দিন আপনার শ্বশুর হয়ে বসেন? তাঁকে কি তাড়াতে পারি?'

'সত্যিই যদি উনি শ্বশুর হয়ে বসেন তো তখন কি আপনার টাকা আদায় হবে ভেবেছেন?···তখন চাইতে গেলে ঐ শ্বশুরটি লেলিয়ে দেব। প্রাণ নিয়ে পালাতে পথ পাবেন না!'

সারা সকালটা বসে বসে ভাবল সর্বেশ্বর। যতই পিসি এবং বনমালী ঘোষালের যৌথ আক্রমণের কথা কল্পনা করতে লাগল ততই ওর নাড়ী ছাড়বার উপক্রম হ'ল। গায়ে ঘাম দিতে লাগল।

না, মুখে যতই বলুক—পারবে না সে ঠেকাতে। তার চেয়ে পালানোই বুদ্ধিমানের কাজ। পালানো এবং এই বেলা সময় থাকতে পালানো।'

আর একটা ভাঙা-গোছের টিনের সুটকেশ ছিল সেইটেতে একখানা কাপড়, গামছা আর এটা-ওটা জিনিস ভরে নিয়ে সর্বেশ্বর খাওয়া-দাওয়ার পরই বেরিয়ে পড়ল। যাবার সময় ঠাকুরের হাতে পাঁচটা টাকা দিয়ে বলে গেল, 'এই নাও তোমার বকশিশ, এবার কিন্তু আর ঢুকতে দিও না—ব'লে দিও, সে এখান থেকে উঠে গেছে!'

আবার পথ। এবার দূরে কোথাও পালাতে হবে। বেশ কিছুদিনের জন্যে। কিন্তু যে দেশেই যাক—হাওড়া আর শিয়ালদা দুই-ই এখন তার কাছে অগম্য। সে চেনে না বনমালীর ভাইপোদের, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে তারা চেনে।

একটা পার্কের ভেতর বেঞ্চে বসে অনেক ভাবল সে। অনেকক্ষণ ধরে ভাবল। তারপর উঠে—দক্ষিণেশ্বরের একখানা বাস্-এ চেপে বসল। সেখান থেকে বালি ব্রীজ পেরিয়ে ওধারে গিয়ে সাইকেল রিক্সা নিয়ে চলে এল সটান শ্রীরামপুর। এইখানে নানা রকমের এক্সপ্রেস প্যাসেঞ্জার থামে। প্রথম যে দূরপথের ট্রেন আসবে তাতেই চেপে যেখানে হোক চলে যাবে সে।

সেদিন কি একটা উপলক্ষও ছিল বুঝি। স্থানীয় কোন মেলাটেলা। স্টেশন লোকে লোকারণ্য। তারই মধ্যে কোনমতে ঠেলেঠুলে জায়গা ক'রে নিয়ে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসে পড়ল। সেই বেঞ্চিতে আরও গুটিকতক লোক বসেছিল আগে থেকেই। তার মধ্যে ঠিক ওর পাশেই যে বৃদ্ধটি বসেছিল, তার দিকে ওর নজরে পড়তে বিশেষ ক'রে চেয়ে দেখল। লম্বা লম্বা চুল ও গোঁফদাড়ি—পাকা শণের মতো সাদা ধপধপ করছে। কতকটা যাত্রার দলের নারদের মতো চেহারা। চোখে একটি রঙীন চশমা। ভদ্রলোক পাশে-রাখা একটি টিনের স্যুটকেশে ঠেস দিয়ে মলিন উড়ুনির প্রান্তে ঘাম মুছছেন। লোকটির মুখভাব বড় হতাশ। দেখে মায়া হ'ল সর্বেশ্বরের।

—'দাদু কতদূর যাবেন ?' যেচেই আলাপ করে সে।

'আর ভাই যাওয়া!' চাদরের প্রান্তটা নেড়ে হাওয়া খেতে খেতে বলেন বৃদ্ধ,—'যেতে পারলে তো বাঁচতুম !···সংসারের ঘানি-গাছে যে বাঁধা পড়েছি ভাই, এ জোয়াল ঠেলে যাবো কোথায় ! ঘুরছি তো ঘুরছিই। সে-ই একপথে ঘুরছি !'

এ কথার আর জবাব কি ? সর্বেশ্বর চুপ ক'রে থাকে।

বৃদ্ধই একটু পরে বলেন, 'ঘরে ছ-টি প্রাণী খেতে, রোজগার করতে আমি একা। ক্যানভাস করি, তা এই ভীড়ে বুড়োমানুষের গলা পৌঁছবে কেন ? আজ এক পয়সাও রোজগার হ'ল না এই এত বেলা পর্যন্ত। অথচ তারা বসে আছে আমি চাল ডাল নিয়ে গেলে তবে হাঁড়ি চড়বে। গলা বুজে আসে শেষের দিকে।

'কিসের ক্যানভাস করেন আপনি ? ওষুধের ?'

'না ভাই, ওষুধ-বিষুধ আর পাবো কোথায়। তাতে তো কিছু মূলধন লাগে। উপযুক্ত ছেলে এক বছর ভুগে মারা গেল, শেষ কড়িটি অবধি বেরিয়ে গেছে।...এতে আছে মাতুলি। স্বপ্নাদ্য মাতুলি। দু-পয়সা ক'রে একটা মাতুলি পড়ে গ্রোস দামে কিনলে, বুঝলে না ভায়া ? তার মধ্যে অবিশ্যি আছে একটু—বেলপাতায় একটা মন্তর লিখে পুরে দিই। সওয়া পাঁচ আনায় বিক্রি করি। তার ভেতর থেকে আবার এক পয়সা তুলে রাখি মার পূজোর জন্যে। বছর অন্তর পয়লা বৈশাখ সব পয়সা হিসেব ক'রে পূজো দিই। তা তোমার কী ভায়া, মাজন না হাতকাটা তেল ?'

'কিসের মাতুলি আপনার ? কি সারে ?' কথাটা এড়িয়ে যায় সর্বেশ্বর।

'মাতুলি ঐ একরকমই। বলি—তোমার কাছে মিছে কথা ব'লে লাভ কি, তুমিও যখন এই পথের পথিক—বলি অনেক রকম। সাদা সুতোয় বাঁধা এগুলি অর্শের মাতুলি। নীল সুতোয় এটা হাঁপানি, লাল সুতো হচ্ছে পুরনো আমাশা। আর কালো সিল্কের সুতোয় বাঁধা আছে সেগুলো মেয়েদের। মানে ওঁয়াদের যাবতীয় গণ্ডগোল আর কি। সর্বপ্রকার জটিল স্ত্রী ব্যাধির অব্যর্থ মাতৃদত্ত মাতুলি। (এটা চাপা বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলেন ভদ্রলোক) সুতোর দরুণ এক আনা আলাদা নিই।'

সর্বেশ্বর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলে,—'দাদু, যদি কিছু মনে

না করেন তো বলি, আমি একবার দেখব চেষ্টা ক'রে? যদি আপনার মাদুলি কটা বেচে দিতে পারি?'

'—ছাখো না ভাই। পারবে কি?' তারপর সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলেন,—'তা তুমি কি হিসেব নেবে? তোমাকে তো এ লাইনে দেখি নি কখনও?'

'আমি কিছুই নেব না দাদা। আমি এ লাইনে নতুন বটে, তবে তা হোক, আপনি ভাববেন না। আমার এই সুটকেস জামিন রইল।'

এই বলে সে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির সুটকেস নিয়ে উঠে পড়ল এবং মেয়েদের ওয়েটিং হলের সামনে যেখানে ভীড় বেশ জমাট, সেইখানে গিয়েই—বলতে গেলে এক হুঙ্কার দিয়ে উঠল—'বিনামূল্যে! বিনামূল্যে! একেবারে যাকে বলে ফ্রি—মা'র আদেশে বিনামূল্যে বিতরণ।'

বলা বাহুল্য নিমেষে সকলের মনোযোগ ওর ওপর এসে পড়ল। দু পাঁচজন এসে ঘিরেও দাঁড়াল। সর্বেশ্বরের ততক্ষণে বক্তৃতা এসে গিয়েছে। একটা ঝোঁকের মাথায় এসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল—অত কিছু ভাবে নি—কিন্তু এখন যেন ব্যাপারটা নেশার মতোই পেয়ে বসল তাকে। সে বলতে শুরু করল—'সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ! একবছর একদিন, মা'র আদেশে তিনশ ছেষট্টিটি দিন, এই কাজ ক'রে বেড়াতে হবে আমাকে। একশ' একুশ দিন হয়েছে আর দু'শ পঁয়তাল্লিশটি দিন হ'লেই আমার ছুটি।...মার আদেশ! কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে মাকে ডেকেছিলাম—মার স্বপ্নাদেশ হয়েছিল, যদি ভাল হই তো এক বছর একদিন এই সংবাদটি প্রচার ক'রে বেড়াতে হবে, তার পর ছুটি।...নেওয়া না নেওয়া আপনাদের ইচ্ছা। বেচতেই হবে মা'র এমন কোন নির্দেশ নেই। নিলে এখন দাম লাগবে না। সেরে গেলে দাম। সে

দামও—মনে রাখবেন—সে দামও আমি নেব, না কালীঘাটের কালীবাড়িতে গিয়ে পূজো দিলেই সে দাম পৌঁছবে। এখন আপনাদের মর্জি।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সহস্রকণ্ঠে নানা প্রশ্ন ওঠে—'কিসের মাদুলি মশাই? কি কি রোগ ভাল হয়?' 'টি-বি সারে—হ্যাঁ ভাই?' 'কৈ ভাই দেখি, পেটের অসুখের কী আছে?' 'কিছুই কি নেবেন না?' ইত্যাদি—

'শুনুন শুনুন—একটু স্থির হোন।' প্রায় বিপন্ন-কণ্ঠেই বলে সর্বেশ্বর—'হাঁপানি, অর্শ, পুরনো আমাশা আর স্ত্রীরোগ—এই চার রকমের মাদুলি আছে আমার কাছে। তার বাইরে দয়া ক'রে কেউ চাইবেন না, দিতে পারব না। দাম ষোল আনা—সে আপনারা ভাল হ'লে দেবেন। আপাতত আমার মাদুলি, রেশমী সূতো আর মা'র অগ্রিম পূজো একটি পয়সা—এই নিয়ে মোট ছ'আনা একপয়সা জমা দিতে হবে। তাও ব'লে রাখছি বেশী নেই এখন আমার কাছে, শ'খানেকের কিছু কমই হবে। সবাই চাইবেন না, দিতে পারব না। পরশু মঙ্গলবার ভোরবেলা স্নান পূজো সেরে তবে এই ওষুধ জোগাড় করতে বেরোব। তার আগে দিতে পারব না, দয়া ক'রে মাপ করবেন।'

কে একজন ব'লে উঠল 'সওয়া ছআনা দিতে হবে? তবে যে বললে বিনামূল্যে?'

সেদিকে ফিরে একটু মিষ্টি ক'রে হাসে সর্বেশ্বর, 'আজকালকার দিনে তামার মাদুলির একটা দাম কত? সিল্কের সূতো, সেগুলোও কি ঘর থেকে দেব ভাই? মা'র তো সে আদেশ পাই নি। পেলে তা-ও দিতে হ'ত। প্রচার করবার কথা প্রচার করছি, বেচতেই যে হবে তার কোন মানে নেই। কেউ না নিলে আমি তো বাঁচি। নতুন ওষুধ যোগাড় করা, মাদুলি ভরা, ঝঞ্ঝাট কি কম? বিনা-

মাইনের চাকরি খতম হ'লে বাঁচি।'

কিন্তু তার কথা শেষ অবধি শোনাই গেল না।

'ও মশাই, এদিকে একটা অর্শর।'

'এই যে দাদা—আমাশার একটা দেবেন ?'

'এই নিন সওয়া ছ-আনা, হাঁপানির একটা।'

'চেঞ্জ আছে নাকি দাদা ? পাঁচটাকার নোটের ? আমাশার তাহ'লে ছুটো নিতুম।'

'খাওয়া-দাওয়ার নিয়মটা কি বললেন না—আর কোন বিধি-নিষেধ আছে ?'

'ও দাদা, আমারটা কৈ ?'

'দাঁড়ান দাঁড়ান, আমার তো ভাই ছুটো বই হাত নয়। দিচ্ছি দাদা। না ভাই, চেঞ্জ হবে না।···জয় মা।···নিয়ম ? কিছু না, কিছু না! তিনদিন শাক অম্বল কড়াই-এর ডাল নিষেধ। হাঁপানিতে ডিম মাংস চলবে না। খেতে গেলে মাছুলি খুলে রেখে খাবেন, আবার পাঁচ পয়সা জরিমানা দিয়ে পরবেন। জরিমানা কোন কালীবাড়িতে জমা ক'রে দেবেন।···হ্যাঁ, শনি কি মঙ্গলবার পরতে হবে। এই যে, কী বললেন অর্শ ?···হ্যাঁ, শুনুন, আপনার একটু নিয়ম আছে। মাছুলি ধুয়ে একটু ক'রে দুধ খাবেন, পেঁপের আটার সঙ্গে—'

দেখতে দেখতে বাক্স নিঃশেষ হয়ে মাছুলি চলে গেল, তার বদলে সেটা বোঝাই হয়ে উঠল পয়সায়। সবগুলি শেষ ক'রে 'মা মাগো। তোমারই কৃপা মা।' ব'লে কপালে হাত ঠেকালে সর্বেশ্বর। তারপর হাত জোড় ক'রে বলল, 'আজকের মতো মাপ করুন দাদারা, আজ আর নেই। আবার সেই মঙ্গলবার দুপুরে। নমস্কার।'

ফিরে এসে দাছুর পাশে স্যুটকেসটা নামিয়ে রেখে কোঁচার খুঁটে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল—'নিন দাছু, আপনার কী

মাল ছিল হিসেব মিলিয়ে দাম বুঝে নিন। দু'একটা দাম কেউ কম দিয়েছে কিনা বলতে পারব না, যা কাড়াকাড়ি।'

বৃদ্ধ সুটকেস খুলে মাদুলির বদলে সিকি, দু'আনি, আনিতে বাক্স বোঝাই দেখে অবাক হয়ে যান।

'এ কী কাণ্ড ভাই! সব বেচে ফেলেছ? এরি মধ্যে?'

'আমি কি বেচেছি দাদা। মা'র দয়া। মা-যা করান।'

'তা ঠিক। কিন্তু তুমি ভাই নিশ্চয় জাদু জানো। কী ব'লে আর আশীর্বাদ করব, ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক। কী বলব, এতগুলি প্রাণীকে উপবাসের হাত থেকে বাঁচালে।'

তারপর গুণে গেঁথে নিয়ে বলেন, 'ঠিক আছে, সাড়ে সাঁইত্রিশ টাকা—কেউ ঠকায় নি। একটা কথা কিন্তু ভাই, তোমাকে কিছু নিতে হবে।'

'না-না দাদু—আমার কিছু দরকার নেই। আজ একটু ভাল মাছটাছ নিয়ে যান, নাতি-নাতনীরা আনন্দ ক'রে খাবে।'

'না ভাই, তা হয় না। তুমিও আমার নাতির মতোই।'

তিনি একরকম জোর ক'রেই ওর হাতে কতকগুলো রেজকি গুঁজে দিলেন। ইতিমধ্যে একটা লোক্যাল ট্রেন এসে গিয়েছিল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক সেই গাড়িতে উঠে চলে গেলেন।

এইবার শোনা গেল লুপ লাইনের গাড়ি আসবে। ভিড় ক্রমেই বাড়ছে। সর্বেশ্বর একটা বিড়ি ধরিয়ে পায়চারি করতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে নজরে পড়ল একটা বেঞ্চির কাছে বড় ভিড়। লোকজন ঠেলে সরিয়ে এসে দেখল—একটি বৃদ্ধ লোক বেঞ্চিতে শুয়ে আছেন, তার মাথার কাছে একটি তরুণী মেয়ে উদ্বিগ্ন মুখে বসে হাওয়া করছে। মুখে-মাথায় জলও দেওয়া হয়েছে—চারিদিকে ছড়ানো জল ও বৃদ্ধের মাথার দিকে চাইলেই তা বোঝা যায়।

'সরুন তো সব—সরুন তো! দেখছেন হাওয়ার দরকার। সব ঘিরে দাঁড়িয়ে হাওয়া বন্ধ করেন কোন্ আক্কেলে তা বুঝি না। সরুন সবাই—'

মুহূর্তে পাণ্ডা হয়ে ওঠে সর্বেশ্বর। ঠেলে গুঁতিয়ে ভিড় সরিয়ে দেয় খানিকটা। ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করে—'সামলে নিয়েছেন খানিকটা? জ্ঞান হয়েছে?'

কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাইতে গিয়েও—ওর দিকে নজর প'ড়ে মেয়েটির দৃষ্টি কঠিন হয়ে ওঠে। শুষ্ককণ্ঠে বলে শুধু, 'হ্যাঁ।'

ফস ক'রে পাখাখানা ওর হাত থেকে কেড়ে নেয় সর্বেশ্বর। তারপর জোরে জোরে হাওয়া করতে থাকে। হাওয়া করতে করতেই প্রশ্ন করে, 'এমনি হয় নাকি মধ্যে মধ্যে? মিরগী নয়?'

'না না', মেয়েটি আগের মতোই নিরসকণ্ঠে বলে, 'বাবার লো-প্রেসার আছে তাই মাথা ঘোরে। এখানে এসে গরমে ভীড়ে হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেছল। আপনি পাখাটা দিন, বাবা এখন ঠিক হয়ে গেছেন!'

সর্বেশ্বর পাখা দেয় না। কিন্তু বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি নিজেই উঠে বসবার চেষ্টা করেন এবার। তখন পাখাখানা ফেলে তাড়াতাড়ি ওঁকে ধরে বসিয়ে দেয় সে।

'কোন্ ট্রেনে যাবেন আপনি?'

'এই লুপ-লাইনের গাড়িতে।'

'এই গাড়িতে যাবেন? তা হ'লে তো বেশী দেরি নেই আর। গাড়ি এলো ব'লে, সিগন্যাল দিয়েছে। এ গাড়িটায় খুব ভিড় হয় কিন্তু, এখানেই তো বুঝতে পারছেন ভিড়ের নমুনা! যেতে পারবেন?'

'যেতেই হবে বাবা। সেখানে আমার ছেলের খুব অসুখ, তার পেয়েছি। সামান্য জায়গা, বন-দেশে ডাক্তার বদ্যিও বিশেষ নেই। ওষুধ, ফল, হর্লিক্স সব নিয়ে যাচ্ছি।··এ গাড়িতে তো না উঠলে

চলবে না !···তুমি কতদূর যাবে বাবা, দেবে আমাদের একটু তুলে ?'

'দেব বৈকি ! নিশ্চয় দেব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

মেয়েটি তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, 'না না বাবা, আমরাই উঠতে পারব, কেন আর ওঁকে কষ্ট দেওয়া।'

'তুই বুঝিস না তপু, যে ভিড় হয় এ গাড়িতে। তুই ছেলেমানুষ, আর আমি তো স্থবির। ছেলেটি যখন রয়েছেন, ওঁকে না হয় একটু কষ্ট দিলুমই। হাজার হোক আমার ছেলের বয়সী।'

তপুর বাবা ধমক দিয়ে ওঠেন।

সর্বেশ্বর একটু সরে এসে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে সিগন্যাল দেখছিল। কানে এলো মেয়েটি ফিস্ ফিস্ ক'রে বলছে, 'লোকটাকে আমার ভাল বোধ হচ্ছে না বাবা। নিশ্চয়ই ওর কোন বদ মতলব আছে। ওর চেহারা, বেশভূষা—দেখছ না ?'

তার বাবাও ফিস্‌ফিস্ ক'রেই বলেন, 'না রে না। মতলব আবার কি ? গরীবরাই পরোপকারী হয়, তা জানিস ?'

'পরোপকারী না ছাই !' মুখটা বিকৃত করে তপু।

দেখতে দেখতে গাড়ি এসে গেল। সত্যিই বিষম ভিড় গাড়িতে। ঝুলতে ঝুলতে আসছে সবাই। তাছাড়া এ স্টেশনেও ভিড় কম নয়। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে দু-তিন জায়গায় ঢোকবার বৃথা চেষ্টা ক'রে হাল ছেড়ে দিলেন। তাঁর চোখে জল এসে গেল। সর্বেশ্বরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী হবে বাবা ? ছেলেটাকে বোধ হয় আর জ্যান্ত দেখতে পাবো না !'

সর্বেশ্বর এতক্ষণ যেন মজা দেখবার জন্যই একটু একপাশে সরে দাঁড়িয়েছিল। এবার সে এগিয়ে এসে বলল, 'ভয় কি ! আমি দেখছি।' সত্যিই সে একটা অসাধ্য সাধনই করল। একটা কামরার সামনে গিয়ে দোরের কাছে যারা দাঁড়িয়ে ভিড় ক'রে রেখেছিল তাদের এক এক ঝট্‌কায় সরিয়ে ভেতরে থেকে দু একজনকে টেনে

নামিয়ে চোখের পলকে বৃদ্ধ এবং তাঁর মেয়েটিকে মালপত্রসুদ্ধ ঠেলে উঠিয়ে দিল। বলা বাহুল্য, হৈ-হৈ বড় কম হ'ল না। দু একজন অকথ্য গালাগালি দিয়ে উঠল। 'আরে আরে এ কী? হাত ছাড়ো না!' 'কী মশাই আপনি?' 'কোথাকার নবাবপুত্তুর হে তুমি?' 'বেয়াদব বেল্লিক ছোক্‌রা, দেখবে?' ইত্যাদি ইত্যাদি। দু-একজন রুখে মারতেই এলো।

সর্বেশ্বর নিমেষে তার উগ্রমূর্তি ত্যাগ ক'রে বিনীতভাবে হাতজোড় ক'রে দাঁড়াল, 'দেখুন দাদারা, আমি অন্যায় করেছি। আপনারা রাগ করতে পারেন—তা আমি স্বীকার করছি। আপনারা অপমান করুন, জুতো মারুন, আমি কিছু বলব না। কিন্তু উপায় ছিল না, ঐ বৃদ্ধ ব্লাডপ্রেসারের রুগী যে কোন মুহূর্তে পড়ে মরে যেতে পারে। ওধারে ওঁর একটি ছেলে মুমূর্ষু। না উঠতে পারলে সেই শক্‌-এই ভদ্রলোক মরে যেতেন!'

'তা আমাদের তো বললেই পারতেন।' নরম হয়ে আসে অনেকেই।

'সে সময় কোথা ছিল বলুন। ঐ তো ট্রেন ছেড়ে দিলে। উঠুন উঠুন, কথা বলার সময় নেই।'

তারই ফাঁকে সে নিজেও উঠে পড়ে। তারপর হাত বাড়িয়ে দু-চারজনকে টেনে নেয়। শেষ পর্যন্ত সবাই হয়ত উঠতে পারেও না। কিন্তু তার জন্য ওর পাশের লোকেরা কেউ রাগ করে না। ওর বিনয়-বাক্যে সকলেই ভিজে এসেছে।

তপু আর তার বাবা তখনও বসতে পান নি। ওর বাবা এমন কি পা-টাও ভাল ক'রে রাখতে পারেন নি। একবার সে দিকে চেয়েই অবস্থাটা বুঝতে পারল সর্বেশ্বর। তখনি সে হঠাৎ যেন দোরের কাছে বাকী যারা ছিল তাদের জন্যেই ব্যাকুল হয়ে উঠল, 'ও ভাই, আর একটু কোনমতে ঠেলেঠুলে যান না দাদা, এঁরা যে বাইরে

ঝুলছেন।···না না, এটা মোটে ভাল কথা নয়। কালও ব্যাণ্ডেলে এক ভদ্রলোক এইভাবে যেতে যেতে ডিস্ট্যাণ্ট সিগন্যালে লেগে মারা গেলেন। এমনিই ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছিলেন।···আর একটু। ও দাদা, কোনমতে ভেতরে চলে আসুন। অমন ক'রে ঝুঁকবেন না। পৈত্রিক প্রাণ গেলে আর ফিরবে না—'

এবং এরই ফাঁকে যে যতটা এল বা না এল—সে নিজেই এক সময় ভেতরে ঢুকে এল এবং ঠেলেঠুলে তপুদের পাশে এসে দাঁড়াল।

'এ হে হে, আপনারা এখনও বসতে পারেন নি বুঝি? কিন্তু আপনার তো না বসলে চলবে না। শেষে আবার একটা কাণ্ড বাধাবেন নাকি? এই তো একটু আগে যায় যায় হয়েছিলেন।'

'তা তো বুঝলুম বাবা—কিন্তু কোথায় আর বসব? এ-তো সব বোঝাই—'

'ওরই মধ্যে জায়গা ক'রে নিতে হবে। উপায় কি?···আচ্ছা আমিই দেখছি।' তারপরই সে কাজে লেগে যায়। 'এ বোঁচকাটা কার দাদু? আপনার বুঝি? ওপরে তুলে দিলে কী হয়? জায়গা নেই? সে ভাবনা আমার, এই তো এখানে ঝুলিয়ে দিলেই তো চলবে। বাঃ, বেশ হ'ল, দিব্যি। ভাই আপনি যদি কিছু মনে না করেন—আধ ইঞ্চিটাক একটু পা-টা সরাবেন? এই যে, বাক্সর ওপরটা খালি ক'রে দিতে চাইছি আর কি! বৃদ্ধ-ভদ্রলোকটিকে না বসালে চলছে না যে। আর বলবেন না ভাই, ভিড় উনি মোটে সহ্য করতে পারেন না। এই তো একটু আগেই ভিরমি গিয়েছিলেন। অতিকষ্টে সুস্থ হয়েছেন। কিন্তু শরীর তো এখনও দুর্বল। আবার যদি মূর্ছা যান তো আর ভাল করা যাবে না—।'

তার পর অনেকদূরে অবস্থিত একটি হিন্দুস্থানী ছোক্‌রাকে ধমক দিয়ে ওঠে—'এই বাবা, জেরা তুম উধার হটো না। দেখ্‌তা হ্যায়

বুড্‌ঢা মানুষ—তুম আরাম করেগা আর এই বুড্‌ঢা আদ্‌মি দাঁড়ায়কে দাঁড়ায়কে যায়েগা ?'

ওরই মধ্যে গাড়িতে একটু গুঞ্জন ওঠে।—'তাতো বটেই, বুড়ো মানুষ।···ও মশাই আপনি একটু পা-টা সরান না। তাহ'লেই তো ভদ্রলোকের—। মেয়েটিই বা এই ভিড়ে দাঁড়িয়ে যায় কী ক'রে—?'

দেখতে দেখতে জায়গা হয়ে গেল। সুশ্রী তরুণী মেয়েটিকে দেখে দু'একজন নিজেরা মালের ওপর বসে জায়গা ছেড়ে দিলে। ফলে তপুও বসবার জায়গা পেলো, তার বাবাও। আর সেই ফাঁকে সর্বেশ্বরও ওঁদের কাছে একটি বাক্সর ওপর জায়গা ক'রে নিয়ে জাঁকিয়ে বসল।

'আঃ!' আরাম-সূচক একটা শব্দ ক'রে গুছিয়ে বসেন বৃদ্ধ—'ভাগ্যে তুমি ছিলে বাবা! এসব কি আর আমার কর্ম! ভগবানই তোমায় জুটিয়ে দিয়েছেন। বড় ভাল ছেলে তুমি? তা তুমি কোথায় যাবে বাবা?'

তপুর কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি পছন্দ হয় না। সে অগ্নিকটাক্ষে বাবার দিকে চেয়ে চোখটা ফিরিয়ে নেয়।

'আমি?' প্রশ্নটা ক'রে কিছুকাল মৌন থাকে সর্বেশ্বর। তারপর একটু হেসে বলে—'কী জানি!'

বৃদ্ধ রীতিমত বিস্মিত হন, 'কি জানি কি বাবা, কোথায় যাবে তা জানো না?'

আরও কিছুকাল চুপ ক'রে থাকে সর্বেশ্বর। তারপর বলে—'সত্যিই জানি না। কথাটা আপনারা বুঝবেন না। কিন্তু আমার কিছুই ঠিক-ঠিকানা নেই। এমনিই ঘুরে বেড়াচ্ছি। এই গাড়িতে যে উঠব তাই কি ছাই জানতুম!'

বৃদ্ধও এবার একটু সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন, 'টিকিট করো নি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,। তা একটা করেছি! বর্ধমান অবধি টিকিট একটা

কাটা আছে। তারপর যেখানে নামব সেখানেই বাড়তি ভাড়াটুকু দিয়ে দেবো।'

টিকিট একখানা বার ক'রে দেখায়ও সে। তপুর বাবা খুশী হয়ে ওঠেন। যেন একবার বিজয়-গর্বে মেয়ের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলেন,—'তা তুমি আমাদের সঙ্গে চলো না তাহ'লে, দুদিন থেকে যাবে!'

সঙ্গে সঙ্গে তপু বাইরে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনে,—'কী তুমি বলছ বাবা? দাদার তো সেই একটুখানি বাসা ভরসা। বৌদি একা। ওঁকে নিয়ে গিয়ে তুমি তুলবে কোথায়? ওঁর কষ্ট হবে না?'

কণ্ঠস্বরটা তার রীতিমত তীক্ষ্ণই হয়ে ওঠে।

'না না। কষ্ট আবার কি! আর একটু কষ্ট হ'লেই বা। ওরা সব আজকালকার ছেলে, পরোপকারী। ওরা অমন একটু আধটু কষ্ট গ্রাহ্যই করে না।—না বাবা, তুমি আমাদের সঙ্গেই চলো।'

সর্বেশ্বর এই সময় ইচ্ছা ক'রেই পাশের একটি যাত্রীকে নিয়ে যেন ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু তপুর কথা তার কানে যায় ঠিকই—'বাবা, তুমি একটা সর্বনাশ না বাধিয়ে দেখছি ছাড়বে না। লোকটা কখনই ভদ্রলোক নয়। জোচ্চর গাঁজাখোর টাইপের লোক। ওর কোন বদ্ মতলব আছে—তাই অত গায়ে-পড়ে ভাব জমাচ্ছে!'

'তুই থাম দিকি মা!···তোরা সব তাইতে বড় লোককে অবিশ্বাস করিস!' চুপি চুপি জবাব দেন বৃদ্ধ।

এইবার সর্বেশ্বর মুখ ফেরায় এদিকে, 'কী বলছিলেন আপনাদের সঙ্গে যাওয়া? না থাক্, এ যাত্রা আর এত সহজে থামবার ইচ্ছে নেই। গাড়িতে যখন চেপেছিই তখন যতদূর যায় যাক না!' তারপর জোর ক'রে যেন প্রসঙ্গটা থামিয়ে দিতেই কথা পাড়ে।—'আপনার ছেলে ওখানে করেন কি?'

'আর সে কথা বলো না বাবা। এম.এস্‌সি. পাশ ক'রে ভাল

সরকারী চাকরি পেয়েছিল—সে পছন্দ হ'ল না। বলে চাষবাস করব। চাকরি ছেড়ে এই বনগাঁয়ে এসে উঠল। জমি জমার বেধড়ক খাটুনি—সে কী আর ঐ কলেজে-পড়া ছেলেদের সহ্য হয় বাবা? প্রায়ই অসুখ, প্রায়ই অসুখ! লাভ তো খুব। আমাকেই এখনও সংসার টানতে হচ্ছে ওদের। মিছিমিছি বৌটার ভোগান্তি। ওরে বাবা, চাষ-বাস করলে সংসার চলে ঠিকই—কিন্তু ওটিকে ইংরিজী ক'রে এগ্রিকালচার করো, ব্যস্—লাভের দফা খতম। যার যা। কলেজে পড়ে চাষবাস হয়?' বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন বৃদ্ধ। তারপরেই মনে পড়ে যায়। আগের কথার জের টেনে বলেন, 'সেই জন্যেই তো বলছি, চলো না বাবা। তুমি সঙ্গে থাকলে উপকারও হয় একটু। আমি অন্তত মনে বল পাই।'

সর্বেশ্বর হেসে বলে,—'আমাকে দিয়ে আপনার আর কতটুকু উপকার হবে বলুন। ও-কথা আর তুলবেন না। মাঝখান থেকে আপনার কন্যা ভয় পাচ্ছেন। ভাবছেন যদি সত্যিই আমি আপনাদের সঙ্গে গিয়ে উঠি, হয়তো বা রাতারাতি আপনাদের সবাইকে খুন ক'রে পালাব।'

এই সোজাসুজি আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না তপু। সে নিমেষে রাঙা হয়ে উঠল,—'না না, তা কেন। তা কেন। বা, আমি কি তাই বলেছি।'

'বলেছিস বৈকি, একশ বার বলেছিস। ঠিক বলেছ বাবা। ঐ রকমই বটে ওর মনোভাব। দ্যাখো মা তপতী, তোমাদের ঐ কলেজ-পড়া বিদ্যেয় সব জিনিস বুঝতে এসো না। তোমরা ভাবো বুঝি বেশভূষাটাই মানুষের আসল পরিচয়!

সর্বেশ্বর তাড়াতাড়ি বলে ওঠে,—'না না, ওঁকে মিছিমিছি দোষ দিচ্ছেন। কথাটা সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য। আপনারাও কি সময়-বিশেষে তাই করেন না? আর ওঁরই বা দোষ কি, আমার

যা বেশভূষা আর চেহারা—ভদ্রসন্তান ব'লে আমারও ক্লেম করা উচিত নয়।'

'না না—সে কি কথা। ছাখো বাবা, যে শিক্ষা বাইরের পোশাক ভেদ করে আসল মানুষে পৌঁছতে শেখায় না, আমি সেটাকে শিক্ষা ব'লেই মনে করি না।···কিন্তু তুমিই বা এমন ক'রে বেড়াচ্ছ কেন বাবা! কোথায় যাবে তাও জানো না, তুমি কি সন্ন্যাসী?'

এতখানি জিভ্ বার ক'রে সর্বেশ্বর বলে, 'পাগল। বৈরাগ্য বা ঈশ্বর-চিন্তা আমার এতটুকু নেই।'

'তবে?'

ওদিকে তপতীও যেন একটু নড়ে চড়ে বসে। ওর দিকেই যে কান—সেটা বেশ বোঝা যায়।

মাথা হেঁট ক'রে নিজের একটা নখ খুঁটতে খুঁটতে সর্বেশ্বর বলে,—'কী বলব বলুন। সে দীর্ঘ ইতিহাস। দেশে বাড়িঘর জমি-জায়গা আছে। নিজেও লেখাপড়া শিখেছি। একটা ছোট ভাই ছিল—বুঝলেন? খুব ভালবাসতুম তাকে। মা-মরা ভাই। আমি অল্প বয়সেই চাকরিতে ঢুকেছিলুম। বেশ ভাল চাকরিই করতুম, বাবা বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করলেন তাঁর এক বন্ধুর মেয়ের সঙ্গে। বন্ধুর মৃত্যুর পর বাবাই তাদের—মানে তাকে আর তার ভাই-বোনদের—দেখাশুনো করতেন। এ বিবাহের প্রস্তাবে আমার আপত্তি ছিল না, বরং আগ্রহ ছিল। কিন্তু কপালে ঘর-সংসার লেখা নেই—হ'ল না!'

সর্বেশ্বর চুপ করল।

'কেন বাবা, কেন হ'ল না?'

আড়ে একবার তপতীর দিকে চেয়ে যেন গলাটা নিচু করবার চেষ্টা ক'রে সর্বেশ্বর বলে, 'মেয়েটি এসে জানাল যে সে আমার

ছোট ভাইকে ভালবাসে, তাকেই সে বিয়ে করতে চায়। আমি নিজের বিয়ে ভেঙে দিলুম। ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল তার। আমার মনে কেমন একটা স্বার্থত্যাগের নেশা চাপল। আমি বললুম, ভাইকে বিলেত পাঠাবো। বাবা রাজী হলেন না। আমিই জোর ক'রে পাঠালুম। প্রাণপণে খরচ চালাতে লাগলুম, একরকম না খেয়ে। শুধু শুধু, একজনকে সুখী করব ব'লেই যেন—আমার সব কিছু পণ করলুম। ভাই ওখানের পড়া শেষ করল কিন্তু আর ফিরল না। জানাল যে সে সেখানেই ভাল চাকরি পেয়েছে। বাবা মারা গেলেন। ভাইকে লিখলুম যে তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে যাও। কোন উত্তর এল না। তখন বন্ধুবান্ধবদের ধরে ওখানে যোগাযোগ করলুম, খবর এল—সে সেখানে আর একটি বিয়ে করেছে। এ খবর আমি তার স্ত্রীকে দিই নি। কিন্তু আমার মুখ দেখেই বোধ হয় ভাদ্রবৌ সন্দেহ করেছিল। সে গোপনে সে-চিঠি বার ক'রে পড়ল। তারপর ফল যা হবার তাই হ'ল। সে আত্মহত্যা করল।··· এই হ'ল মোটামুটি ইতিহাস। চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। ভদ্রজীবন আর ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে ঘরে ফিরি আর বেশির ভাগই এমনি ক'রে ঘুরে বেড়াই। গাছতলায় ভিখিরীদের জীবন। তাও যে ভাল লাগে তা নয়, ঐ ত্রিশঙ্কুর মত শূন্যে ঝুলে আছি আর কি !'

ম্লান একটু হাসে সর্বেশ্বর। উদাসভাবে চায় আর একদিকে। কিন্তু অপাঙ্গ নজরটা থাকে তার তপতীর ওপরেই। তপতীর মুখ কিন্তু ইতিমধ্যে বিবর্ণ হয়ে গেছে। তার চোখদুটো ছলছল করছে রীতিমতো। বেশ একটু সশ্রদ্ধ চোখেই চেয়ে আছে সর্বেশ্বরের দিকে।

বৃদ্ধ ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, 'তা ব'লে তুমি এমনি ক'রে বাকী জীবনটা কাটাবে বাবা ? যারা বেইমান, যারা তোমার মুখ চাইল না,-তাদের জন্যে তুমি সারা জীবন নষ্ট করবে ?'

'না না। নষ্ট করব কেন। ঘর দোর জমি-জমা কিছুই নষ্ট করি

নি। হয়ত আবার ফিরে যাবো। সংসারী হয়েই বসব আবার। শুধু এখন যেন কিছুতেই পারছি না—বাঁধাধরা ছকেফেলা জীবন কাটাতে আর মেপে মেপে হাসতে লোকের সঙ্গে, বুঝলেন না!'

সবার আড়ালে চোখদুটো মুছে নিয়ে ধরা গলায় বলে তপু, 'বাবা আমাদের নামবার সময় হ'ল কিন্তু—'

'হ্যাঁ, এই যে।' ব্যস্ত হয়ে ওঠেন তার বাবা, 'এই যে। তুমিও কিন্তু বাবা চলো আমাদের সঙ্গে। না না, কোন কথা শুনতে চাই না। লক্ষ্মী বাবা, চলো।'

সর্বেশ্বর হেসে বলে, 'যাই না যাই, আমি আপনাদের সঙ্গে নামছি চলুন। আপনাদের যাওয়ার ব্যবস্থা না ক'রে দিয়ে—'

'না না। আপনি চলুন।' ব'লে অকস্মাৎ ঝোঁকের মাথায় ওর একটা হাতই চেপে ধরে তপতী। তার চোখ তখনও লাল, চোখের পাতায় জলের আভাস।

সামান্য একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে সর্বেশ্বর বলে, 'এই আপনাদের এত বুদ্ধির অহঙ্কার! এই সামান্যতেই গলে গেলেন? আমি যদি বলি যে আমি আগাগোড়া মিছে কথা বলেছি? যদি বলি যে কস্মিন্‌কালেও আমার ভাই ছিল না? মা-বাপকে জন্মে দেখি নি, এক পিসীর কোলে মানুষ হয়েছি? যদি বলি যে স্রেফ ভবঘুরে আমি একজন—?'

'তা হ'লেও বিশ্বাস করব হয়ত। কিন্তু তাতে আপনার ওপর থেকে বিশ্বাস যাবে না। তবুও বলব—আপনি চলুন আমাদের সঙ্গে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাবেন বৈকি। তুই ওর কথা শুনিস নি তপু। এখনই মিছে বলছে।'

ওর বাবা গলায় জোর দিয়ে বলেন। সর্বেশ্বর হাসি-হাসি মুখে চুপ ক'রে যায়।

ইতিমধ্যেই স্টেশন এসে পড়ে ওঁদের। সামান্য স্টেশন—লোকজন নেই কেউ-কোথাও। নামলেনও ওঁরা ঐ তিনজন। মোট-মাটারি সুদ্ধ কোনমতে টেনে নামাল সর্বেশ্বর। চারদিকে চেয়ে দেখে বৃদ্ধ উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলেন, 'তাই তো, একটা গোরুর গাড়ি-টাড়িও তো দেখছি না। মুটে পেলেও না হয় হেঁটে যাবার চেষ্টা করতুম। এত মালসুদ্ধ যাই-ই বা কি ক'রে ?'

সত্যিই প্ল্যাটফর্মটি জনমানব শূন্য। এককোণে স্টেশন মাস্টারের ঘর। টিকিটবাবু অনেকক্ষণ আগেই সেই কোটরে ঢুকে গেছেন। সর্বেশ্বর ব্যস্ত হয়ে বলে, 'আপনি কিছু ভাববেন না। দেখছি আমি একটা ব্যবস্থা করতে পারি কিনা—'

বৃদ্ধটি বলেন, 'তুমি বাবা কিন্তু পালিও না যেন। অবশ্য আমাদের সঙ্গে যাবে।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পথ রোধ ক'রে দাঁড়ায় তপতী, 'আপনি কথা দিয়ে যান—আমাদের সঙ্গে যাবেন! নইলে এখন কোথাও যেতে হবে না। আপনিই চলুন আমাদের সঙ্গে, মোটঘাট আমি নেব এখন।' করুণ মিনতি তার চোখে।—'চলুন লক্ষ্মীটি। নইলে ভাবব আমার অশিষ্ট আচরণে আপনি রাগ করেছেন।'

সর্বেশ্বর, জীবনে বোধকরি এই প্রথম, একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তার কপালে ঘাম দেখা দিল। সে একবার বিমূঢ়ভাবে নিজের গালের খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফে হাত বুলিয়ে নিল। দৃষ্টিটা নিয়েই যেন সব চেয়ে অসুবিধা। সেটা কখনও নিজের অতি মলিন জামা-কাপড়ের ওপর, কখনও বা তপতীর পরিপাটি বেশভূষার ওপর ঘুরে এসে—একসময় তার নিজের হাতটার ওপর এসে নিবদ্ধ হ'ল। কিন্তু সে কয়েক মুহূর্তই। তারপরই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—'আপনারা আমার মতো একটা হতভাগাকে এত বেশী দাম দিচ্ছেন যে আমি এই প্রথম একটু লজ্জা বোধ করছি।

আচ্ছা, আগে দেখি না—একটা গাড়ি বা কোন লোকজন কাউকে জোগাড় করতে পারি কিনা।' এই ব'লে সে আর বাদানুবাদের অবকাশ না দিয়ে একরকম তপতীকে পাশ কাটিয়েই চলে গেল স্টেশন-ঘরের দিকে।

স্টেশন-ঘরে ছোট টিকিটবাবু একা বসে একটা বিরাট খাতায় টিকিটের নম্বর তুলছিলেন—সর্বেশ্বর গিয়ে ঢুকল।

'শুনুন, ছোটবাবু শুনছেন?'

তিনি খাতা থেকে একটু বিরক্ত ভাবেই মুখ তুললেন, 'কী চাই?'

'আজ্ঞে—একটি বাবু আর একটি মেয়েছেলে নেমেছেন। গাঁয়ে যাবেন। বাবুর শরীরটা বড় খারাপ। একটা গাড়ি কি নিদেন একটা মুটেও যদি পাওয়া যেত।'

'গাড়ি আগে থাকতে খবর না দিলে আসে না। মুটে নেই এখানে।'

এক কথায় মামলা ডিসমিশ। তিনি আবার নিজের খাতায় মন দিলেন।

সর্বেশ্বর দুহাত কচ্‌লে আবারও বললে—'না, তাই বলছিলুম—। উনি আবার আমাদের লাইনেরই এ. টি. এস সাহেবের শ্বশুর কিনা। আর ঐ মেয়েটি হ'ল গে তাঁর শালী—'

'য়্যাঁ!' নিমেষে উঠে দাঁড়ান ছোটবাবু, 'এ. টি. এস—মানে আমাদের রাধাশ্যামবাবুর শ্বশুর? কী সর্বনাশ!' ভয়ে মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে তাঁর। 'হারামজাদা কৈলেসটা আবার গেল কোথায় ছাই! হারামজাদা দিনরাত কোয়ার্টারে কোয়ার্টারে জল তুলে বেড়াবে—। বেটার চাকরিটা যে ইস্টিশানে তা একবারও মনে থাকে না বেটার। কী বিপদে পড়লুম বলো দিকি। বড়বাবু থাকলেও যা হয় হ'ত।...অ কৈলাস, অ হারামজাদা নচ্ছার ব্যাটা,

গেলি কোথায়, অ কৈলাস—' ছোটবাবু পড়ি কি মরি ক'রে ছুটলেন। কাছা খুলে তাঁর মাটিতে লুটোচ্ছে, ভ্রূক্ষেপও নেই।

সর্বেশ্বর আর এক মিনিটও দাঁড়াল না। কাজ হয়ে গেছে, গাড়ি যেমন ক'রেই হোক একটা যোগাড় হবে এবার—সে বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত। এখন আত্মরক্ষা করা দরকার। স্টেশন ঘরের ওপাশে একটা খোলা জানলা ছিল। সেইটে দিয়ে লাফিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল সে। তারপর তারের বেড়া টপ্‌কে প্ল্যাটফর্মের ওপাশে নিচে আগাছার ঝোপে পড়ে হেঁট হয়ে আড়ালে আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে লাগাল দৌড়। দৌড়-দৌড়-দৌড়। একেবারে স্টেশন এলাকা থেকে বহুদূরে এসে হাঁফ ছাড়বার জন্যেই বোধহয় একটু দাঁড়াল। এক চাষী মাঠে কাজ করতে করতে অবাক হয়ে চেয়ে ছিল। সে এইবার ওকে দাঁড়াতে দেখে প্রশ্ন করল—'কী হয়েছে গা বাবু।'

সর্বেশ্বর উত্তর দিলে—'সাপ!'

'সাপ? কোথায় গো মশাই?'

'কেঁচোর গর্তে।'

'কেঁচোর গর্তে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। কেঁচোর গর্তে। কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরোয়, শোন নি কখনও? এত্তো বড় ময়াল সাপ। খুব বেঁচে গিয়েছি বাবা।' সে আবারও হনহন ক'রে হাঁটতে শুরু করল।

বনমালী ঘোষাল সত্যিই শুধু হাতে ফিরবেন তা কেউ আশা করে নি। ওঁর স্ত্রী-কন্যা তো নয়ই, সর্বেশ্বরের পিসীমাও না। ওঁর স্ত্রী মুখনাড়া দিয়ে বললেন—'তা হ'লে এতদিন ধরে সেখানে পড়ে থেকে কী হ'ল? পরের পয়সায় বসে বসে খেয়ে আমাদের কেদাত্থ করলে, না? তখুনি বলেছিলুম বেয়ান, যে ও মিন্‌সের কাজ নয়। শুধু বচনটি আছে ওঁর—কাজের বেলা ঢুঁ-ঢুঁ, অষ্টরম্ভা।'

—'ঐ লাও ঠেলা! দোষটা বুঝি হ'ল শুধু আমারই। সে যে কী জাহাঁবাজ ছেলে তা তো জানো না। সে আমাকে এক হাটে বেচে আর এক হাটে কিনতে পারে।···কোথায় যে ঘাপ্‌টি মেরে রইল, টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পেলুম না।'

পিসীমার কথাটা আদৌ ভাল লাগল না। তিনি বললেন, 'ও কি কথা গা বনমালী, ছেলেমানুষ বে করতে ভয় পায় ব'লেই পালিয়ে বেড়ায়। জাঁহাবাজি এখন সে দু-তিন জন্ম তোমার কাছে শিখতে পারে!'

বনমালীর স্ত্রীর কণ্ঠ ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, 'বলি কেন গা বেয়ান, ওঁর জাহাঁবাজিটা এত দেখলেন কোথায়! আপনার ছেলে যদি এতই ছেলেমানুষ তো তার বিয়ে দিতে গেছলেন কেন? আমাদের কী গরজ ছেলের পেছনে গরু-তাড়া ক'রে বেড়াবার? আমাদের মেয়ে কি ফ্যাল্‌না, না তার বর জুটছিল না?'

'না, এ মাগীরা দেখছি এইখানেই কুরুক্ষেত্তর্‌ বাধিয়ে তুললে। এর চেয়ে বাবা সেইখানেই বেশ ছিলুম। খাও দাও, চা খাও, সিগারেট খাও, গল্প করো। হাড়ে হাড়ে বুঝছি, বাবাজী আমার কেন বিয়ে এড়িয়ে যেতে চাইছেন। যদি এ জন্মের কথা আর-জন্ম পর্যন্ত মনে থাকে তো আর এ কাজে যাচ্ছি না কখনও। এই নাকে কানে খৎ—এই নাকে কানে খৎ!'

গৃহিণী সঙ্গে সঙ্গে ঝেঁঝে ওঠেন—'বেশ তো, সংসারে যদি এতই অশান্তি তো সেইখানেই রইলে না কেন? আমরা হ'তেই তোমার যত অশান্তি নয়? কে চালাত এই সংসার শুনি? এতদিন থাকতে কোথায়? অকম্মার ঢেঁকি—একটা যদি কাজে আছে। ঠিকানা জানো, সব জানো, একটা ছেলেকে ধরে আনতে পারলে না। আবার মুখ নাড়ছ!'

'ঘাট হয়েছে—ঘাট হয়েছে আমার ফেরা। এই চললুম।'

গজগজ করতে করতে তখনই আবার বনমালী ফিরে যাবার উপক্রম করলেন। অবশ্য শেষ অবধি আর যেতে হ'ল না—শঙ্করী এসে একটা হাত ধরল—'ঢের হয়েছে। বুড়ো বয়সে রাগারাগি করতে লজ্জাও করে না। নাও চলো—চান করবে চলো—'

॥ ৯ ॥

বর্ধমান জেলার ছোট্ট একটি গ্রাম। বাজার ব'লে কিছু নেই। হাটতলা আছে; হাট বসে সেখানে। তা ছাড়া সামান্য যা দু-চারটে দোকান আছে তা সবই স্টেশনকে কেন্দ্র ক'রে। যাত্রী যারা নামে বা ওঠে, তারাই এই দোকান ক'টির ভরসা। কলকাতা থেকে প্রথম ট্রেন আসে এখানে ভোর পাঁচটায়, তারপর এই একেবারে বিকেলে। মাঝে আর একটা গাড়ি আসে, তবে সে কলকাতায় যায়। সে গাড়িতে খদ্দের মেলে না বিশেষ। সেইজন্যে এই বিকেলের ট্রেনটির ওপরই সকলের ভরসা। সেদিনও সকলে বিশেষ ক'রে প্রস্তুত হয়ে বসে ছিল। সামনের রাস্তায় জল ছিটিয়ে, চায়ের জল চাপিয়ে, খাবারের গামলাগুলো সামনে সাজিয়ে, যাকে ব'লে তৈরি হয়েই অপেক্ষা করছিল।

খবরটা দিলে কেষ্টধন প্রথম—'হে রে, এস্টেশানে গাড়ি লেগেছে।' বিপ্রদাস উঁকি মেরে দেখে বললে—'আরে সত্যিই তো, হৈ-হৈ, ও চরণ, কড়াটা চাপা, কড়াটা চাপা।'

কেষ্টধন বললে—'আমার চায়ের জল চাপানোই আছে। জল ফুটছে ইরিমধ্যেই।'

হঠাৎ রসভঙ্গ করলে বিড়িওলা সুরেন—'দাঁড়া, দাঁড়া। লাফাস নি আগে থাকতে। কটা লোক নামে আগে ছাখ্।'

কেষ্টধন দোকানের বাইরে এসে দাঁড়ায়—'সত্যিই তো। লোক কৈ? ও বিপ্রদা, খাবারের খদ্দের কৈ তোমার?'

বিপ্রদাস দুটো হাত চোঙার মতো ক'রে দেখে বলে—'তাইতো দেখছি। একটি লোকই তো নামল। ঐ যে স্যুটকেশ হাতে—আর লোক কৈ?'

কেষ্ট বললে—'য়্যাঁ— ? হ্যাঁ-হ্যাঁ। দেখতে পেয়েছি। যাক—একটা লোক নামল তবু। ছাখো কে কত মাল বেচতে পারো।'

জোরে জোরে হেসে ওঠে সে নিজের রসিকতাতেই।

ট্রেন থেকে নেমেছিল সর্বেশ্বর। সেদিন তপতীর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ঘুরতে ঘুরতে বর্ধমানেই গিয়েছিল। সেখানে গিয়েই মন স্থির ক'রে ফেলে। ওখানকার রাণীগঞ্জ বাজার থেকে কিছু মাদুলি আর কয়েক শিশি ওষুধ পাইকিরি দামে কিনে স্যুট্‌কেশ বোঝাই করেছে। তারপর টিকিট ঘরের সামনে স্টেশনের তালিকাগুলোর দিকে চেয়ে যে নামটা প্রথম চোখে পড়েছে সেইখানকারই টিকিট কিনেছে। নামটা উঠেছিল এখানকারই—সুতরাং এখানে নামা ছাড়া আর গত্যন্তর কি? তাছাড়া—তার কাছে সব জায়গাই তো সমান।

সর্বেশ্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে রাস্তায় পা দিতে ওকে অনেকটা পরিষ্কার দেখা গেল। সুরেন নাকমুখ সিঁটকে বললে—'একটা লোক, তাও লোকের যা ছিরি। ঐ লোক তোমাদের চা খাবার খাবে? আরে, ছোঃ! বরং আমার খদ্দের হ'লেও হ'তে পারে।'

এতক্ষণে সকলেই ভাল ক'রে দেখেছে ওকে। বিপ্রদাস মুখে একটা অবজ্ঞাসূচক শব্দ ক'রে বললে—'ধ্যুস্। নামা রে কড়াটা নামা, শুধু শুধু ঘিটা পোড়ে কেন?'

কেষ্টধন বললে—'দোকানদার তো সুরেনকে নিয়ে ঘেটের আটটি, খদ্দের নামল একটা, এখন নে—কে কী নিবি নে। পারিস

তো খদ্দেরটাকেই ভাগ ক'রে নে। ওর ঐ হাড়-কখানা ছাড়া আর যে কিছু আছে ব'লে তো মনে হয় না।'

সুরেন বললে—'তা যা বলেছিস, তোদের বরাতে ঢুঁ-ঢুঁ তো বটেই, এখন আমার কপালে কী জোটে তাই ছ্যাখ্—বিড়ি খাবার আধলাটা আছে কিনা তাই সন্দেহ।'

ততক্ষণে সর্বেশ্বর একেবারে কাছে এসে পড়েছে। বিপ্রদাস চাপা ধমক দিয়ে উঠল—'চুপ। চুপ কর্ তোরা।'

সর্বেশ্বর সামনে এসে পড়ে এক লহমায় চারদিকে চেয়ে পরিস্থিতিটা বুঝে নিল। চায়ের দোকানেও বেঞ্চি আছে, তবে জায়গাটা ভাল না! সে একেবারে বিপ্রদাসের বেঞ্চিতেই ব্যাগটা নামিয়ে যেন কতকটা আপন মনেই ব'লে উঠল—'গুরু। গুরু। তোমার এ বেঞ্চিটাতে বসব একটু ঘোষের পো!'

বিপ্রদাস যদিচ ঘোষের পো নয়, তবু সে তখনই কোন প্রতিবাদ করল না। বরং যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গেই বলল—'বসুন, বসুন।'···তারপর দেশীয় রীতি অনুযায়ী প্রশ্ন করল—'মশায়ের নিবাস?'

'নিবাস?' প্রশ্নটার পুনরুক্তি ক'রে মিনিটখানেক চুপ ক'রে থাকে সর্বেশ্বর, তারপর বলে—'বলতে নিষেধ আছে হে, গুরুর নিষেধ। নিবাস আর আমাদের নেই। নিবাস এখন তোমার বাড়ি, গাছতলা—যেখানে খুশি ধরে নিতে পারো।'

সুরেন, কেষ্টধন ওরা সবাই এর ভেতর ভীড় ক'রে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। সুরেন চাপা গলায় চরণকে বলল—'ওই! এ বেটা আসল ভণ্ড রে।'

বিপ্রদাসের দেবদ্বিজে ভক্তির কথা সর্বজন-বিদিত, সে একটু সম্ভ্রমের সুরেই প্রশ্ন করল—'আপনি কি তাহ'লে সন্নিসী আজ্ঞে।'

সর্বেশ্বর তখনই কথাটার জবাব দিলে না। বিপ্রদাসের হাতে

ছিল হুঁকো, সেদিকে হাতটা বাড়িয়ে বলল, 'দেখি ভাই তোমার কলকেটা একটু।' তারপর অনুমতির অপেক্ষামাত্র না ক'রেই কলকেটা টেনে নিয়ে হুশ হুশ ক'রে কয়েকটা টান দিয়ে আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে বললে, 'কী বললে, সন্ন্যাসী? সন্ন্যাসী আর হ'তে পারলুম কৈ বলো ভাই? মায়া যে বড় কঠিন। কেউ নেই, কিছু নেই, পথে পথে ঘুরছি, তবু মনে হয় সংসারটা বড় মিঠে। এ চক্র থেকে কী পরিত্রাণ পাবার উপায় আছে ভাই?'

বিপ্রদাসের কণ্ঠস্বরে এবার দস্তুর-মতো সম্ভ্রম ফুটে ওঠে। সে বলে, 'আজ এখন কোথা থেকে আসছেন তাহ'লে?'

'এখন? কলকাতা থেকে।'

'এখানে কোথায় যাবেন?'

সর্বেশ্বর আবারও কিছুক্ষণ মৌন থাকে। বলে, 'কোথায় যে যাবো তা কিছুই জানি না। এখানে বেশ ভদ্রলোকের পাড়াটাড়া আছে?'

বিপ্রদাস উত্তর দেয়—'আজ্ঞে, আপনি কী কাজে এসেছেন সেটা জানতে পারলে—'

সর্বেশ্বর কিছুক্ষণ চোখ বুজে চুপ ক'রে থাকে। তারপর আবারও ব'লে ওঠে—'জয় গুরু! জয় গুরু!···গুরুর কাছে সন্ন্যাস নিতেই গিয়েছিলুম। গুরু দীক্ষা দিলেন কিন্তু গেরুয়া দিলেন না। বললেন, —সংসারের মায়া এখনও তোর কাটে নি। এখনও অনেকদিন তোকে সংসারে ঘুরতে হবে। আমি হাত জোড় ক'রে বললুম কিন্তু কী ক'রে ঘুরবো বাবা—সম্বল তো কিছুই নেই। তাঁর দয়া হ'ল। তিনি দুটো জিনিস দিলেন। বললেন—এই দুটো জিনিস তুমি ফিরি ক'রে বেড়াওগে, এতে তোমারও পেট চলবে, পাঁচজনেরও উপকার হবে। এক বৎসর সংসারে থাকবার পর তখনও যদি এ মতি থাকে তো আবার এসো। তখন দেখব। যদি বুঝি তো সেই

সময়ে গেরুয়া দেব।···সেই থেকেই পথে পথে ঘুরছি!' এই ব'লে সশব্দে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে সে,—'আরও পাঁচটি মাস না গেলে তাঁর দর্শন পাবো না।'

সুরেন অস্ফুটকণ্ঠে ব'লে ওঠে,—'ধ্যেৎ! যতো সব বুজরুকি!'

কেষ্টধন কিন্তু কৌতূহল চাপতে পারে না। বলে, 'কি জিনিস আপনার জানতে পারি কি?'

সর্বেশ্বর একটু হাসল। বলল, 'সে আর জেনে কি করবে ভাই। তোমাদের ও কোন কাজেই লাগবে না। একটা জ্বরের ওষুধ আর একটা স্বপ্নাদ্য মাদুলি।'

বলতে বলতেই কিন্তু স্যুটকেশটা খুলে ফেলে ও। বাক্সের একপাশে গাদা-করা ওষুধের শিশি আর মাদুলি। তারই ফাঁকে অত্যন্ত ময়লা একটা কাপড় আর তেলচিটে একখানা গামছা। সুরেন একটা শিশি তুলে নিয়ে দেখল তার লেবেলে সত্যিই এক সন্ন্যাসীর ছবি ও নাম ছাপা আছে।

'এ ছবিটা কার আজ্ঞে—শিশির গায়ে?' চরণ প্রশ্ন করে।

'ঐ তো আমার গুরুদেব', দুহাত তুলে উদ্দেশে প্রণাম জানায় সর্বেশ্বর। তারপর বলে,—'হাটবারটা কবে ভাই এখানের? ঐ হাটের দিন গিয়ে বসব আর কি। যা দু একটা বিক্রী হবে তাতেই আমার চলে যাবে।'

'হাটবার তো পরশু। তা আপনি থাকবেন কোথায় এ দুদিন?'

সর্বেশ্বর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দেয়, 'যেখানে হোক পড়ে থাকব দুদিন। তারপর এখানকার হাটটা দেখে আবার ভেসে পড়ব। এই তো আমার কাজ। এখন তো শুধু দিন্ গুণছি কবে আবার গুরুদেবের শ্রীচরণে আশ্রয় পাবো।'

বিপ্রদাস একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলে, 'আপনার নামটা জানতে পারি কি? আপনারা?'

সর্বেশ্বর বললে, 'আমরা ভাই ব্রাহ্মণ। নাম শ্রীসর্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়।'

সুরেন হঠাৎ খাপছাড়া ভাবে প্রশ্ন ক'রে ব'সে,—'আপনার ও ওষুধের দাম কত?'

কেষ্টধন ধমক দিয়ে ওঠে,—'তুই থাম্ না সুরেন। তোর অত খবরে দরকার কি?'

অপ্রতিভ ভাবে সুরেন জবাব দেয়—'না এমনি। আর ও মাদুলি? কিসের মাদুলি ওটা মশাই?'

সর্বেশ্বর বেশ সহজ ভাবেই জবাব দিল,—'মাদুলিটা হ'ল সঙ্কট-মোচন মাদুলি, যে কোন বিপদে পড়লে ধারণ করলেই বিপদ কেটে যায়। তবে বারো মাস হাতে পরে রাখতে নেই। মাদুলির দরুণ পূজো পাঁচ টাকা, সুতোর দাম চার পয়সা।···ওষুধ হ'ল জ্বরের; খুবই সস্তা, চোদ্দ আনা।'

সুরেন শিশিটা রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, 'চলো হে কেষ্ট দা—'

'চলো চলো।'

সর্বেশ্বর প্রশান্ত মুখে শিশিটা স্যুটকেসে রেখে স্যুটকেসটা বন্ধ ক'রে ফেলল।

বিপ্রদাস অনেকক্ষণ ধরেই একটা কি যেন বলি-বলি করছিল। এইবার সাহসে ভর ক'রে মাথাটাথা চুলকে ব'লেই ফেলল, 'একটা কথা নিবেদন করব কি?'

'বিলক্ষণ। আমি তো পথের মানুষ হে। আমাকে আবার সঙ্কোচ কি?'

বিপ্রদাস আর একবার কেশে নিয়ে বললে,—'ময়রার দোকান করি বটে তবে আমরা ঘোষের পো নই—ময়রাও নই। আমরাও ব্রাহ্মণ। আমার নাম বিপ্রদাস ভট্টাচার্য। উপাধি ভট্টাচার্য—নইলে আসল পদবী হ'ল বাঁড়ুয্যে, শাণ্ডিল্য গোত্র। যদি আপত্তি

না থাকে তো এই দুটো তিনটে দিন না হয় আমার বাড়িতেই থেকে যান না।'

সর্বেশ্বর বললে,— 'বলো কি হে! তোমার সাহস তো কম নয়। চেনা নেই শোনা নেই, বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ঢোকাবে! তারপর যদি আমি চুরি-ডাকাতি ক'রে নিয়ে পালাই?'

বিপ্রদাস একটা ছোট রকমের দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'কী আর নেবেন। নেবার মতো কি আর কিছু আছে? সম্বল তো এই দোকানটুকু, তা দেনায় দেনায় তাও যেতে বসেছে। এই তো একটুখানি জায়গা, ক'টাই বা লোক নামে দিনে রাতে। এতগুলো দোকান এখানে চলে কি ক'রে বলুন দেখি! জমি যা আছে কোনমতে খোরাকির ধানটা হয়, বাকী খরচ যে কী ক'রে চালাই তা আমিই জানি।'

সর্বেশ্বর একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে বলে—'তবে চলো তোমাদের বাড়িতেই যাই। মোদ্দা বাড়ির ওঁয়ারা আবার গালগাল দেবেন না তো? কোথাকার কে এক হতভাগাকে জুটিয়ে নিয়ে এলে ব'লে?'

বিপ্রদাস বললে, 'না না, সে ভয় নেই। চলুন। আসুন। চরণ দেখো ততক্ষণ, আমি ঘুরে আসছি।'

দুজনে বাজার থেকে বেরিয়ে মাঠের পথ ধরল। সর্বেশ্বর পথ চলতে চলতে প্রশ্ন করল,—'বাড়িতে কে কে আছেন তোমার ভট্‌চায্‌?'

'কে আবার থাকবে। মা আর একটা বোন।'

'বিয়ে করো নি?'

'না। বোনটার বিয়ে না দিয়ে—। এই তো বাজার!'

এদিকে ওরা চলে যাবার পরই একটা বিদ্রূপের ঝড় বয়ে গেল! সুরেন বললে,—'ব্যাটা ক্যানভাসার, ফন্দিটা ভেঁজেছে ভাল।'

কেষ্টধন বললে, 'বিপ্রদাসেরও তেমনি, সন্নিসি দেখলে তো ভক্তি উথলে উঠল একেবারে। অথচ ঐ তো অবস্থা। ঘরে তোর একটা সোমত্থ আইবুড়ো বোন, তুই একটা ভণ্ড জোচ্চোরকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ঢোকাস কোন আক্কেলে?'

হরিশ বলল, 'মরবেন যখন তখন বুঝতে পারবেন আর কি।'

॥ ১০ ॥

বিপ্রদাসের বাড়ি দোকানের কাছেই, মাত্র আধ পোয়াটাক পথ। খড়ের বাড়ি, বাইরের দিকে বৈঠকখানা ঘর, মাঝে মস্ত বড় উঠোন তারই একপাশে দুটো মরাই, আর এক কোণে শীর্ণ গুটি-দুই গরু, ওদিকে আর দুটো শোবার ঘর। শোবার ঘরের দাওয়ার লাগোয়া রান্নাঘর। বাইরের ঘরের বারান্দায় সর্বেশ্বরকে দাঁড় করিয়ে রেখে ওদিক দিয়ে ঘুরে বিপ্রদাস বাড়ির ভেতর গেল। অসময়ে ওকে ফিরতে দেখে মা এবং বোন পুঁটি দুজনেই হাতের কাজ ফেলে ছুটে এলো। মা প্রশ্ন করলেন, 'কী রে খোকা? এখুনি চলে এলি যে? শরীর ভাল আছে তো?'

'না না, সে সব কিছু নয়। একটি ব্রাহ্মণ আশ্রয় পাচ্ছিল না, তাকেই নিয়ে এলুম।' মাথাটাথা চুলকে কোনমতে ব'লে ফেলে বিপ্রদাস।

পুঁটি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সুরে ব'লে উঠল, 'তা তো আনবেই। গ্রামের জমিদার। সহস্রপুষীর বংশ তোমাদের, অতিথি-অভ্যাগত তোমার দোরে আশ্রয় পাবে না তো পাবে কোথায়? ভাবনাও তো নেই, বিনা মাইনের রাঁধুনী আর চাকরানী আছে বাড়িতে। শুধু মুখের কথা খসালেই হ'ল।'

'আঃ পুঁটি, চুপ কর না।...বিপ্রদাস ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'শুনতে পাবে যে।'

মা-ও তাড়াতাড়ি বলেন, 'এনে যখন ফেলেছে, রাগারাগি ক'রে আর কি হবে বল্। যা খোকা, দোর খুলে দিয়ে বসাগে যা।'

দাঁতে দাঁত চেপে পুঁটি বলে, 'সত্যি, লোকে বলে না—যার ন' বছরে আক্কেল হয় না, তার নব্বুই বছরেও হয় না! তা এ হয়েছে তাই! চিরদিন তোমার সমান গেল!'

বিপ্রদাস আর কথা না বাড়িয়ে সরে পড়ে। ভেতর দিয়ে গিয়ে দোরটা খুলে দিয়ে সর্বেশ্বরকে আহ্বান করে, 'আসুন আসুন! বসুন। এই চৌকিটার ওপর বসুন ভাল ক'রে। চান করবেন নাকি?'

'—চান? না চান আমি বড়-একটা করি নে। মুখে হাতে জল দিলেই চলবে।'

'তা হ'লে আপনার মুখ-হাত ধোওয়ার জল দিতেই বলি। আপনি বসে একটু বিশ্রাম করুন। আমি এই সন্ধ্যের গাড়িটা দেখেই চলে আসছি।'

বিপ্রদাস চলে গেল। চৌকিটার ওপর একটা মাদুর পাতাই ছিল। তার ওপরই চিৎ হয়ে শুয়ে সর্বেশ্বর একটা বিড়ি ধরালো। সারাদিনের ঘোরাঘুরি ও ক্লান্তিতে দেহটা অবসন্ন হয়ে পড়েছে। তাই শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি চোখে তন্দ্রা নেমেছিল একটু। সহসা নারী-কণ্ঠের সম্ভাষণে চমকে জেগে উঠল।

'আপনার মুখ-হাত ধোবার জল এই বাইরে রেখেছি, দাওয়ার ধারে। মুখ-হাত ধুয়ে নিন। চা আনতে যাচ্ছি।'

সর্বেশ্বর ভাল ক'রে চেয়ে দেখল। একহারা লম্বা চেহারা, গায়ের রংটাও ফরসা নয়। বছর উনিশ-কুড়ির অত্যন্ত শ্রীহীন চেহারার একটি মেয়ে। অবজ্ঞায় মুখটা ঘুরিয়ে নিল সে।

পুঁটি ডেকেই চলে গিয়েছিল। সর্বেশ্বর উঠে বাইরের দাওয়ায় আসতে আসতে আপন মনেই ব'লে উঠল,—'সকাল বেলা। এর নাম সোমত্থ মেয়ে ? মেয়ে তো নয় ব্রেষকাঠ ! ছিরি বলতে কি কিছু নেই ? শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু।'

বাইরে মাজা ঝকঝকে গাড়ুতে জল আর তার ওপর পাট-করা পরিষ্কার গামছাখানি দেখে অনেকদিন বাদে কে জানে কেন সর্বেশ্বরের মনটা বড় খুশী হয়ে উঠল। সে ঘাড়ে-মাথায় বেশ ক'রে জল দিয়ে, পা ধুয়ে গামছায় মুখ-হাত মুছে ঘরে এসে বসল। ততক্ষণে পুঁটি একটি রেকাবিতে তুটি রসগোল্লা, একঘটি জল আর এক কাপ চা রেখে গেছে। জলযোগ শেষ ক'রে আবারও একটা বিড়ি ধরাল সর্বেশ্বর।

দোকানে পৌঁছতেই বিপ্রদাসের ওপর দিয়ে যেন একটা লাঞ্ছনার ঝড় বয়ে গেল। সুরেন বললে, 'আচ্ছা বিপ্রদা, এতখানি বয়স হ'ল, তবু তোমার একটা বুদ্ধি-বিবেচনা ব'লে কিছু হ'ল না ? ঐ আস্ত ভণ্ডটাকে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে ঢোকালে ?'

চরণ বললে, 'তুমি মনিব, আমি তোমার কারিগর—বলা উচিত নয়, কিন্তু কাজটা ভাল করো নি দাদা।'

কেষ্টধন বিদ্রূপ ক'রে বললে, 'আক্কেল জিনিসটা কাউকে দেওয়া যায় না রে ভাই, যার থাকে তার আপনিই থাকে।'

বিপ্রদাস আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বলে, 'কী করি, বামুন মানুষ, কোথায় কার ঘরে যাবে—তাই—'

হরিশ বললে, 'হ্যাঁ তাই বই কি। আসলে তুমি ঐ যে একটু সন্নিসীর গন্ধ পেয়েছ !···আর রক্ষে আছে ? গলে গেলে একেবারে। মরবে, মরবে, এই করতে করতে একদিন মরবে।'

বিপ্রদাস অপরাধীর মতো নীরবে নত-মস্তকে সব লাঞ্ছনা সহ্য

করে। অনুতাপও যে হয় না তা নয়—কিন্তু উপায় কি ?

খানিক পরে সন্ধ্যার ট্রেনটা দেখে রাত্রিতে কী কী কাজকর্ম হবে চরণকে উপদেশ দিয়ে বিপ্রদাস যখন বাড়ি ফিরল, সর্বেশ্বর তখন গাঢ় ঘুমে অচৈতন্য। তারই ফাঁকে কখন পুঁটি এসে একটা আলো রেখে গেছে তা সে টেরও পায় নি। বিপ্রদাস ঘরে ঢুকে কেশে গলা-খাঁকারি দিয়েও যখন ঘুম ভাঙাতে পারল না, তখন অকারণে একটা টুল তুলে সরিয়ে একটু বড় গোছের আওয়াজ করল। সেই আওয়াজেই ঘুম ভেঙে গেল সর্বেশ্বরের। ধড়মড় ক'রে উঠে বসে বলল, 'এই যে, কখন এলে ভট্চায্‌? ইস্‌, খুব ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।'

'এই আসছি। তারপর ? জলটল পেয়েছিলেন ? চা দিয়েছিল একটু ?'

'বসো। বসো। হ্যাঁ সবই পেয়েছিলুম। খুব যত্ন করেছে খুকীটি। অনেকদিন পরে এত আরাম পেয়েই তো ঘুম এসে গিয়েছিল। ঐটি তোমার বোন বুঝি ?'

বাইরে থেকে এই সময় খনখন ক'রে বেজে উঠল পুঁটির গলা, 'লোকের আক্কেল না থাকলে তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয়। তা তোমার ছেলের মা সে বুদ্ধিটুকুও নেই। খড়ের ঘর—তা ছাড়া খরার দিন, কাঠ-কাঠরা শুকিয়ে বারুদ হয়ে আছে। এর ভেতর যদি তক্তপোশে শুয়ে ঘুমোতে ঘুমোতে বিড়ি খায় আর যেখানে সেখানে জ্বলন্ত বিড়ির টুকরো ছুঁড়ে ফেলে তো কী মনে হয়? মনে হয় না যে আমাদের ঘরে আগুন লাগাতেই এসেছে ?'

ওদিকে থেকে চাপা আওয়াজ আসে, 'চুপ কর না পুঁটি। দাদাকে তখন বলিস।'

'চুপ তো ক'রেই আছি মা। অসৈরণ সইতে পারি না তাই—'

একটু অপ্রতিভের হাসি হেসে সর্বেশ্বর বলে, 'সত্যিই কাজটা

গর্হিত হয়ে গেছে। বিড়ি খেতে খেতে ঘুমোনোটা ঠিক হয় নি। কিন্তু'—চারিদিকে তাকিয়ে দেখে—'বিড়িটা গেল কোথা ?'

আসলে পুঁটিই সেটা সরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, সর্বেশ্বর টের পায় নি। এঁটো বাসন নিতে ঘরে এসে শিথিল হাত থেকে জ্বলন্ত বিড়িটা তক্তপোশে পড়তে দেখে তুলে ফেলে দিয়েছিল।

কিন্তু বিপ্রদাস ইতিমধ্যে বিষম লজ্জিত হয়ে ব্যাকুলকণ্ঠে ব'লে ওঠে—'আপনি ও পোড়ারমুখীর কথায় কান দেবেন না দাদা। ওর কথা-বার্তা ঐ রকমই। মার অতিরিক্ত আদরে ও বাঁদ্‌রী মাথায় চড়ে বসেছে একেবারে। আমার ওপর জোর চালিয়ে চালিয়ে মনে করেছে সব্বাইকার ওপরেই ওর জোর খাটে।'

'যেতে দাও। যেতে দাও। ঐ একটি বোন বুঝি ?'

'একটিতেই সামলাতে পারছি না—দুটি হ'লে হয়তো গলায় দড়ি দিতে হ'ত। একটা বোন, যার-তার হাতেও তো দিতে পারি না। অথচ বিয়ের বয়েস ওর পার হয়ে যেতে বসল, কোথাও কোন যোগাড়ই তো দেখছি না। কি ক'রে যে পার করব ওকে, ভাবলে যেন মাথা খারাপ হয়ে যায়!'

বিপ্রদাস চুপ ক'রে বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবে।

সর্বেশ্বরও নিঃশব্দে কিছুক্ষণ বিড়ি টানবার পর বলে—'দেখ ভট্‌চায্‌, একটা কথা তোমাকে বলা দরকার। তুমি আমাকে ডেকে এনে অশ্রয় দিয়েছ, যত্নও করেছ ঢের, তোমাকে আমি ঠকাতে চাই না।'

বিপ্রদাস বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকে। সর্বেশ্বর নাটকীয় ভাবে খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বলে—'একটু আগে যে সন্ন্যিসী-টন্ন্যিসী বলেছিলুম, ওটা বাজে কথা। আসলে আমি ক্যানভাসার। ওকথাটা বলার মানে হ'ল এই যে, কথাটা লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে ভাল রকম একটা বিজ্ঞাপন হয়ে রইল। পরশু যখন হাটে

যাবো তখন খদ্দেরের অভাব হবে না। তুমি আমাকে সাধুসন্ত ভেবে খাতির করছ ব'লে কথাটা শুনিয়ে দিলুম। এর পরেও যদি আশ্রয় দিতে চাও তো দাও। নইলে সাফ ব'লে দাও আমি পথ দেখি। তবে আমি শুধু-হাতেও থাকতে চাই না। খরচপত্র সব দেব।'

বিপ্রদাস কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বোধকরি খানিক আগেকার লাঞ্ছনাটাই পরিপাক ক'রে নেয়, তারপর বলে, 'না, খরচপত্রের কথা নয়। ব্রাহ্মণের ছেলেকে আশ্রয় দিয়েছি, এখন কি আর তাড়িয়ে দেব? সন্ন্যাসী না হোক অতিথি তো—অতিথি নারায়ণ। আপনি দয়া ক'রে থাকুন, তাই আমার ঢের।'

'সে যা ভাল বোঝো করো। মোদ্দা আমি আমার দায়ে খালাস।'

বিপ্রদাস এসেই বোধহয় তামাকের ফরমাস করেছিল। পুঁটি এসে দোরের কাছ থেকে বললে, 'এই নাও দাদা তামাক।' হাত বাড়িয়ে তার হাত থেকে হুঁকোটা এনে সর্বেশ্বরের দিকে বাড়িয়ে দিলে বিপ্রদাস। তারপর বললে, 'বাড়ি আপনার কোথায় তা হ'লে?'

'বাড়ি আমার হুগলী জেলার এক গ্রামে। সেখানে বিশেষ কেউ নেই—আছেন এক বুড়ি পিসিমা। আমি ধরতে গেলে কলকাতাতেই থাকি।'

'কী করেন—এই ক্যানভাসারি?'

'কলকাতাতে কি এসব চলে ভাই? এটা সম্প্রতি ধরেছি। মন্দ লাগছে না। হয়ত এইটেই চালাবো এখন থেকে।'

আরও একটু চুপ ক'রে থাকে বিপ্রদাস,—'সংসারধর্ম করেন নি?'

'না, ওটা আর হয়ে ওঠে নি।'

'করতে তো হবে। এমনভাবে ভেসে বেড়ালে চলবে কি?'

'চালাতেই তো চাইছি ভাই। সে সব অনেক কথা। ক্রমশ বলব। মোদ্দা সংসারধর্মটি আমার সইবে না।' হুঁকোটা সে বিপ্রদাসের হাতে ফিরিয়ে দিলে।

বাঁ-হাতের তেলোতে হুঁকোর মুখটা মুছতে মুছতে বিপ্রদাস বললে—'ওরা সব আমাকে বড্ড বকাবকি করছিল। বলছিল যে ওর কোন-পুরুষে সন্নিসী নয়। আস্ত একটা জোচ্চোরকে বাড়িতে ঢোকালে—মজাটা টের পাবে।'

সর্বেশ্বর প্রশান্ত মুখে বললে—'তা জানি। কিন্তু দেখে রেখো তুমি, ওরাই আবার সস্তায় মাদুলি নেবার জন্যে তোমার দোরে হাঁটাহাঁটি করবে।'

পরের দিন ভোরে উঠে চা খেয়েই বিপ্রদাস বেরিয়ে গেল দোকানে। সর্বেশ্বর কোথা থেকে একটা বড় পিজবোর্ড জোগাড় ক'রে ভুসোকালি দিয়ে সারা সকাল ধরে তার ওপর বড় বড় ক'রে ওর মাদুলি আর ওষুধের বিজ্ঞাপন লিখল।

সে বাইরের দাওয়ায় বসে যখন এই সব লিখছে, তখনই এক ফাঁকে পুঁটি তাকে দুটি রসগোল্লা আর এক কাপ চা দিয়ে গেছে, উঠে ভেতরে গিয়ে খাবার দরকার হয় নি। লেখা শেষ ক'রে উঠতে ওর মনে হ'ল যে অনেকক্ষণ নেশা করা হয় নি, এবার একটা বিড়ি খাওয়া দরকার। উঠে দাঁড়িয়ে আরামসূচক ভঙ্গীতে পিঠটা ছাড়িয়ে সে বেশ ধীরে-সুস্থেই ঘরে ঢুকল। কিন্তু ভেতরে পা দিতেই ওর চক্ষু স্থির। এ কী কাণ্ড!

ওর টাকা পয়সা বিড়ি দেশলাই চিঠি কাগজপত্র যাবতীয় জিনিস—ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে ওর যা-কিছু বোঝায়, চৌকিতে মাদুরের ওপর কে বেশ সযত্নে সাজিয়ে রেখেছে, মোদ্দা কোটটি নেই। দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখল শুধু কোট নয়—গেঞ্জিটাও উধাও।

যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ ও বিস্মিত হয়ে ভেতরের উঠোনে পা দিয়ে দেখে যে শুধু তার কোট এবং গেঞ্জিই নয়, তার সুটকেস খুলে কাপড়খানাও বার ক'রে নেওয়া হয়েছে এবং সেগুলিকে কে সাবান

দিয়ে কেচে উঠোনে বাঁধা-তারে শুকোতে দিয়েছে।

সে বেশ একটু চড়াগলাতেই ডাক দিলে,—'ভট্চায্। ভট্চায্ বাড়ি ফিরেছ নাকি হে?'

রান্নাঘর থেকে পুঁটি বেরিয়ে এল কিন্তু কাছে এল না। অন্যদিকে চেয়ে উত্তর দিলে,—'দাদা এখন ফেরে না কোনদিন। একটার গাড়ি দেখে ফিরবে।'

সর্বেশ্বর আগের মতোই চড়া গলায় বললে,—'তা তো ফিরবে। কিন্তু আমার জামা-কাপড়গুলো গেল কোথায়? কোটটা? তার পকেটে যে টাকা পয়সা কাগজ-পত্তরগুলো ছিল তাই বা এমন ক'রে বার ক'রে রাখল কে?'

পুঁটি বেশ নৈর্বক্তিক কণ্ঠে উত্তর দিলে—'জামা-কাপড় আমিই সাবান দিয়ে কেচে দিয়েছি। অত ময়লা দেখলে আমার গা ঘিনঘিন্ করে।'

সর্বেশ্বর ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে,—'বেশ করেছ! মাথা কিনেছ একেবারে! কিন্তু ও কোট দিয়ে আমি এখন করব কি? চারদিক কুঁচকে থাকবে যে!'

পুঁটি কিন্তু তখনও বেশ নির্বিকার।

'পেছনেই পাঁচু ধোপা থাকে। তাকে একটা পয়সা দিলেই ইস্ত্রি ক'রে দেবে।'

সর্বেশ্বর গুম্ হয়ে শুধু বললে,—'হুঁ!'

সে ফিরে এসে বসে বিড়ি ধরালে একটা।

একটু পরেই ওধার থেকে তাড়া এল—'চান ক'রে নিন না আপনি!'

সর্বেশ্বর ঝাঁঝের সঙ্গে ব'লে উঠল,—'হ্যাঁ, এখানকার পুকুরের জলে চান ক'রে ম্যালেরিয়া ধরিয়ে বসে থাকি আর কি!'

ওদিক থেকে সঙ্গে-সঙ্গেই জবাব এল—'জল ফুটিয়ে বালতি

ক'রে রেখে দিয়েছি।...আপনি তেল মেখে নিন। দাওয়াতেই তেলের বাটি গামছা সব আছে।'

সর্বেশ্বর রাগ ক'রে বিড়ির টুকরোটা ফেলে দিয়ে দুমদুম ক'রে এসে তেল মাখতে বসল। আপন মনেই বললে, 'আচ্ছা এঁচোড়ে-পাকা মেয়ের পাল্লায় পড়েছি বাবা!'

বিপ্রদাস দুপুরবেলা বাড়ি ফিরতে সর্বেশ্বর বললে, 'ভট্‌চায্ তোমার বোনের কাণ্ডটা একবার ছাখো।'

সব শুনে বিপ্রদাস হেসে বললে, 'আস্ত পাগল একটা।' তারপর একটু বিমর্ষ মুখেই বললে, 'সত্যিই ও নোংরা দেখতে পারে না। তার জন্য খাটেও বেশী, যতটা না করলে নয়—তার ঢের বেশীই করতে হয়, তবুও ও-ই স্বভাব ওর। তাই তো ভাবি, কার হাতে যে পড়বে—'

তারপর বোনকে ডেকে একটু ভর্ৎসনার সুরেই বললে, 'হ্যাঁ রে পুঁটি, ভদ্রলোকের কাপড়-জামা নিলি, ব'লে নিতে নেই? টাকা পয়সা যদি ওর হারায় কিছু, তুই দিতে পারবি?'

পুঁটি বেশ চড়া-গলাতেই, সর্বেশ্বরের যাতে শুনতে কোন অসুবিধা না হয় এমন ভাবে, জবাব দিলে,—'বললে কি কাচতে দিত নাকি? যা পিচেশ!'

॥ ১১ ॥

পরের দিন সর্বেশ্বর ফিরল গুণগুণ ক'রে গান গাইতে গাইতে—

'মন তুমি কৃষি কাজ জানো না,
এমন মানব জমিন্ রইল পড়ে মন
আবাদ করলে ফলত সোনা।'

তারপরই বাইরে থেকে হাঁক দিলে,—'ভট্‌চায্‌ ফিরেছ না কি হে ?'

'হ্যাঁ—এই এলাম।' ব'লে হুঁকো হাতে ক'রে বিপ্রদাস বেরিয়ে আসে।

'তোমাদের দেশটি কিন্তু বেশ! সাতশিশি ওষুধ আর তিনটে মাদুলি বেচেছি, তার ভেতর দুটো পুরো দামে।'

'তাই নাকি ?'

'একটা খালি সস্তায় দিতে হ'ল। ঐ যে তোমাদের বিড়িও'লা সুরেন, সে-ই হাতে-পায়ে ধরে একটা নিয়ে গেল তিন টাকায়! কেমন, বলি নি তোমাকে যে, ওরাই আগে নিতে আসবে ?'

'বলেন কি ? কিন্তু আজই যে আমার কাছে কত কি বলছিল।'

'অমন সবাই বলে। হাতটা দেখো না গিয়ে আজ একবার, কালো রেশমী সূতোয় বেঁধে রাখতে বলেছি।'

খানিকটা হেসে নেয় সর্বেশ্বর আপন মনেই।

'আসুন'—বলে হুঁকোটা বাড়িয়ে দেয় বিপ্রদাস।

নীরবে খানিকক্ষণ তামাক খাবার পর সর্বেশ্বর বলে,—'দ্যাখো, ভাট্‌চায্‌, ভাবছি আর একটা হাট দেখে যাবো। এখানকার বাজারটা ভালো ব'লেই মনে হচ্ছে।'

বিপ্রদাস মনে মনে শঙ্কিত হ'ল। কিন্তু মুখে শুধু বললে—'বেশ তো!'

'মোদ্দা পাঁচ ছদিন আমি অমনি থাকতে পারব না। এই নোটটা রাখো—এটা তোমাকে নিতেই হবে।'

'ছি ছি, কী যে বলেন!' ব্যস্ত হয়ে ওঠে বিপ্রদাস,—'বামুনের ছেলেকে দুদিন বাড়িতে রেখে খোরাকি নেব ?'

সর্বেশ্বর প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে উঠল,—'বেশী চালাকি ক'রো না ভট্‌চায্‌। যা বলছি শোন। নৈলে এখুনি পৈতে ছিঁড়ে এই অভুক্ত

অবস্থায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবো। বামুনের ছেলেকে ছ'দিন ভাত তো অমনি দিয়েছ। এখন যদি আমি দশ দিন থাকি—বসে বসে খাওয়াতে হবে? কী এমন রাজা ইন্দিরচন্দর এলে তুমি হে?'

বিপ্রদাস যৎপরোনাস্তি কুণ্ঠার সঙ্গেই টাকাটা নিয়ে ভেতরে গেল। একটু পরেই শোনা গেল পুঁটির চড়া গলার আওয়াজ, 'তুমি নিতে গেলে কেন ও টাকা। কিসের জন্যে নিতে গেলে? এ কী হোটেল পেয়েছে ও? এত যদি পয়সার গরম তো হোটেলে গিয়ে উঠতে বলো না!'

সর্বেশ্বর সেই নির্জনেই মুখ ভেঙিয়ে বললে,—'রাজনন্দিনীর আত্মসম্মানে ঘা লেগেছে! ছুঁড়ির মুখ ছাখো না! যেমন চেহারা তেমনি বাক্যি!'

খানিক পরে বাইরের দোরের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পুঁটি তাগাদা দিলে,—'চানের জল গরম হয়ে গেছে। তেল মেখে নিন—'

সর্বেশ্বর শুয়ে শুয়ে বিড়ি টানছিল, তেমনিভাবেই জবাব দিলে,—'রোজ রোজ চান করবার আমার দরকার হয় না। আমি আজ চান করবো না।'

পুঁটি তীক্ষ্ণকণ্ঠে জবাব দিলে, 'ভদ্দরলোকের বাড়ি থাকতে গেলে ভদ্দরলোকের মতোই থাকতে হয়। অতই যদি চানে ভয়, গুলির আড্ডায় গিয়ে উঠলেই তো হ'ত।'

রান্নাঘর থেকে পুঁটির মা তিরস্কার ক'রে ওঠেন, 'ও কী হচ্ছে পুঁটি! মুখের লাগাম নেই?'

'তা কি করব! চান না ক'রে গায়ে পোকা হ'লে তো সে পোকা আমাদের বাড়িতেই ঘুরে বেড়াবে।'

সর্বেশ্বর ঝেঁঝে উঠল—'ঝকমারি হয়েছিল আমার এখানে আসা! ঘাট হয়েছিল! আমার আর পরের হাটের জন্যে অপেক্ষা করা চলল না দেখছি, আজই যেতে হবে।'

'ও, তবে তো একেবারে পৃথিবী রসাতলে যাবে।' পুঁটিও সমান জোরে জবাব দেয়।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু ভালমানুষের মতো গিয়ে তেল মাখতেই বসল সর্বেশ্বর। বিপ্রদাস পুকুরে গিয়েছিল স্নান করতে, বাড়ি ফিরে মার মুখে সব শুনে ভিজে কাপড়েই ছুটে এল, সর্বেশ্বরের হাত দুটো ধরে বললে—'ও পাগলির কথা শুনো না ভাই, ও বদ্ধ পাগল।'

প্রশান্তকণ্ঠে সর্বেশ্বর উত্তর দিলে, 'তুমি ক্ষেপেছ ভট্‌চায্। ঐ একফোঁটা মেয়ের কথায় রাগ ক'রে চলে যাবো? আমায় সে বান্দা পাও নি। আমি ঠিক আছি।'

॥ ১২ ॥

বনমালী কলকাতায় ফিরে এসে এবার আর মেসে ঢুকতে পেলেন না। ঠাকুর পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়ে খবরটা দিলে—'সে বাবু চলে গেছেন আজ্ঞে, তল্পিতল্পা সুদ্ধ—সে সীট ভাড়া দেওয়া হয়ে গেছে। ওপরে গিয়ে লাভ নেই।'

বনমালী খানিকটা ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন—'র'সো বাপু, র'সো। এর মানে তো এই হয় যে, সে এখানে এসেছিল? ইস! ক'দিন যদি মেসে না থেকে ঘাপটি মেরে থাকতুম! তা বাপু, এটুকু বেশ পরিষ্কার হ'ল যে সে এ মেস ছাড়ে নি। নইলে তুমি পথ আটকাতে না। তা আমি না হয় তোমাদের ঘর জোড়া করব না। দিনের বেলায় বারান্দা-মারান্দায় পড়ে থাকব, রাতটা ছাদে কাটবে। মন্দ কি?'

'না বাবু। ম্যানেজারবাবুর মানা আছে।'

'বিলক্ষণ! ম্যানেজারবাবুর তো বেশ দয়ার শরীর দেখছি। তা

বাবা এই বুড়ো মানুষ পথে বসে থাকব ?'

'কী করব বলুন আজ্ঞে। যা হুকুম আমাদের ওপর।'

'তা তো বটেই। তবে এটাও শুনে রাখো ঠাকুর, আমার নামও ঐ যাকে বলে গে বনমালী ঘোষাল। আমিও সহজে ছাড়ছি নি। এই দোরে বসে রইলুম আমি। বুড়ো মানুষ না খেয়ে দোরে পড়ে রইল, এই কথাটি তোমার সেই দয়ার অবতার ম্যানেজারবাবুকে ব'লো। ধর্মে হয় একমুঠো ভাত দেবে না হয় দেবে না—'

এবার একটা ক্যাম্বিশের ব্যাগ এনেছিলেন বনমালী ঘোষাল, সেইটিই পেতে বসলেন—চেপেচুপে।···

সকালের দিকে অত কেউ গ্রাহ্য করে নি। কিন্তু বিকেলে অফিস থেকে ফিরেও ওঁকে তদবস্থায় বসে থাকতে দেখে অনেকেই চঞ্চল হয়ে উঠল।

প্রদোষ গিয়ে বিনয়বাবুকে ধরল—'ম্যানেজারবাবু, হোআট ইজ দিজ্ ? পাড়ার লোকে কি ভাবছে বলুন তো ? পাওনাদারের মতো দোর জুড়ে বসে—'

বিনয়বাবু শুষ্কমুখে বললেন—'কী করি বলুন দিকি। বুড়ো-মানুষকে তো আর মারধোর ক'রে তাড়াতে পারি না।'

প্রভাত পাল বলে—'ঐ লোকটা ! দ্যাট স্কাউণ্ড্রেল—যত নষ্টের মূল। আপনিই তো মশাই—আমাদের সকলের অমতে সেই ডার্টি লোকটাকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। যত হাঙ্গামা তাকে নিয়েই। এখন সামলান। আমরা কেন এ অত্যাচার সহ্য করব ?'

বিনয়বাবু ভয়ে ভয়ে বলেন—'কী করব এখন বলুন তো—পুলিশে খবর দেব নাকি ?'

'তা জানি না। এনি হাউ, ক্লিআর আউট দি প্যাসেজ।'

বিনয়বাবু বিষণ্ণমুখে নেমে আসেন, বনমালীকে বুঝিয়ে বলতে যান—'মিছিমিছি এ সব কি হাঙ্গামা করছেন বলুন তো ?'

'বিলক্ষণ? আমি তো কোন হাঙ্গামা করি নি বাপ সকল। একটা কথাও তো কই নি।'

'কিন্তু এ কী বিশ্রী ব্যাপার বলুন দিকি। লোকে কি মনে করে?'

'কি করব বাবাজী! প্রাণের দায়—প্রাণের দায়!'

প্রভাতও এসে দাঁড়িয়েছিল। সে ব'লে উঠল—'কী রকম প্রাণ আপনাদের তাও বুঝি না—যে এমন দায় তার। পৃথিবীতে কি আর পাত্তর নেই? তাকিয়ে দেখেছেন লোকটার দিকে?'

'বিলক্ষণ! দেখেছি বৈকি। সেই সঙ্গে, তারও আগে থেকে, মেয়ের দিকেও যে তাকিয়ে রয়েছি বাবা। তাকে তো তুমি দ্যাখো নি। সাক্ষাৎ মা চামুণ্ডার ডাকিনী যোগিনীদেরই একটি—মা দয়া ক'রে এই অধমের ঘরে ছেড়েছেন। তাই তো এত তাড়া করা বাবাজী, অতিকষ্টে বেড়ালের ভাগ্যে সিকে ছিঁড়েছে, এই পাত্তরটি পেয়েছি, এটি ফসকালে কি আর সহজে মিলবে ভেবেছ? রাধে মাধব, রাধে মাধব!'

'বরাতে যদি থাকে তো আবারও মিলবে।' প্রদোষ বলে।

'হুঁ। বরাত তো চোখে দেখা যায় না বাবা। বরটা দেখা যায়। বর নিয়ে যদি না ফিরি তো আমার বরাতে কী আছে তা ভাবতেও পারো না। তখন যা গৃহের অবস্থা দাঁড়াবে তার চেয়ে এ সরকারি পথ ঢের ভাল।'

'কিন্তু দেখুন এ ভাবে দোরের সামনে বসে থাকাতে এদের বড় আপত্তি। এরা তো পুলিশে খবর দিতেই যাচ্ছিল।' বিনয়বাবু সবিনয়েই বলেন।

'পথে বসাতে যদি এতই আপত্তি থাকে বাবুদের তো, পথ ছেড়ে দিক—ঘরেই আশ্রয় নিই। তবে পুলিশের কথা যদি বলো বাবাজী, ও ভয়টা আর আমাকে দেখিও না। এই বয়সে একশ'টির ওপর ফৌজদারি মামলা করেছি। উকিলকে আইন শেখাতে পারি।...

সরকারি রাস্তায় বসে আছি, এখনও তো রাত হয় নি। পুলিশ কোন্ আইনে তাড়াবে? তাছাড়া ঐ ভ্যাখোগে যাও, লালবাজারের রাস্তাতেও কথায় কথায় লোক বসে যায়, পুলিশ তাড়াতে পারে? আর খাওয়া না খাওয়া তো আমার ইচ্ছে বাবাজী। জেলখানার কয়েদীকেই জোর ক'রে খাওয়ানো আইন নেই।' এই বলে বিজয়গর্বে মাথাটা পিছনে হেলিয়ে সকলের দিকে একবার তাকালেন বনমালী।

এরা সকলে বিপন্নভাবে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। শেষে প্রদোষের মাথাতেই গেল বুদ্ধিটা।

সে হাতজোড় ক'রে বলল, 'তাউই মশাই, দোহাই আপনার, আপনি একমুঠো খেয়ে নিশ্চিন্তি হয়ে বাড়ি চলে যান। আমি আপনাকে ছুঁয়ে কথা দিচ্ছি, তার ঠিকানাটা পেলেই আপনাকে আমরা টেলিগ্রাম করব। নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়—এই তিন সত্যি করছি।'

'বেঁচে থাকো বাবাজী, দীর্ঘজীবী হও। তাহলে তাই চলো বাবা, আপাততঃ পেয়ালা-দুই চা আর কিছু খাবার দিতে বলো। ভাতটা খেয়ে রাতের ট্রেনেই আমি সরে পড়বো, কোন ভয় নেই।'

॥ ১৩ ॥

পুঁটি ভেতর থেকে ডেকে বললে, 'নাপিত এসেছে। শুনছেন।'

'নাপিত? নাপিত কি হবে?'

'নাপিত দিয়ে কি হয়? দাড়ি কামিয়ে নিন।'

'কী সর্বনাশ। এই তো কাল না পরশু—'

'না, তিনদিন হয়ে গেছে। তিনদিন অন্তর না কামালে

বনমানুষের মতো দেখায়।'

'দেখায় তো দেখায়। আমার খুশি আমি কামাবো না।'

'এটা চিড়িয়াখানা নয়। নাপিত কাজের মানুষ, বেশীক্ষণ বসতে পারবে না। কামিয়ে নিন তাড়াতাড়ি।'

'উঃ! রাজনন্দিনীর হুকুম! জ্বালিয়ে খেলে দেখছি। এমন জানলে কোন্ অমুকে এখানে পা দিত।···কৈ হে, পরামানিক, কোথায় গেলে? নাও, এসো। আমার যেমন পাপের ভোগ।'

গজগজ করতে করতে গিয়ে দাড়ি কামাতে বসে সর্বেশ্বর।

রান্নাঘরের দাওয়ায় খেতে দিয়ে বিপ্রদাসের মা ভেতর থেকে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলেন—'খাওয়া দাওয়ার হয়ত খুব কষ্ট হচ্ছে। ওঁরা কী রকম খান তা তো জানি না। পুঁটি একটু জিজ্ঞাসা কর না রে, উনি কেমন খান-টান—'

সর্বেশ্বর প্রবল উৎসাহে বলে, 'আপনি ক্ষেপেছেন মা, মেসের আর হোটেলের খাওয়া খেয়ে মুখ অসাড় হয়ে গিয়েছিল। অনেকদিন পরে এসব মনে হচ্ছে যেন অমৃত। মুখে ছড়া-ঝাঁট পড়ল তবু একটু—'

পুঁটি যেন অন্যদিকে চেয়ে স্বগতোক্তিই করল—'পোড়ার মুখে আবার ছড়া-ঝাঁট!'

মা এবং দাদা প্রায় একসঙ্গেই ধমক দিয়ে ওঠে—'পুঁটি!'

'তা নয় তো কী! দিনরাতই তো মুখে আগুন। যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণই মুখে আগুন। ও মুখ কি আর ছড়া-ঝাঁটে সাফ হবে? লাঙ্গল কোদাল চাই।'

'দূর হয়ে যা দিকি আমার সামনে থেকে!' দাদা ধমক দিয়ে ওঠে।

সর্বেশ্বর কিন্তু বেশ সহজভাবেই হাসে। বিপ্রদাসকে বলে,

'তুমি রাগ ক'রো না ভট্‌চায্‌। বলেছে কিন্তু ভাল—দিনরাতই মুখে আগুন। না, এবার দেখছি বিড়ি খাওয়াটা কমাতে হবে।'

ভেতর থেকে মা আবারও বলেন,—'কী খেতে টেতে হচ্ছে করে ওঁর জেনে নে না খোকা। সত্যিই তো, বারো মাস মেসে খেলে কি আর জিবে সোয়াদ থাকে।'

'কিছু না, কিছু না মা। এই বেশ খাচ্ছি। কতকাল পরে যে সেদিন পাকা আমড়ার অম্বল খেলুম। সুক্তো, ঘণ্ট এসব তো ভুলেই গেছি মা। ছেলেবেলায় পিসিমার হাতে খেয়েছি আর এই খেলুম। ঐ জন্যেই তো আরো নড়তে পারছি না এখান থেকে।

'তা খোকা—উনি চিরজীবনই কি মেসে হোটেলে কাটাবেন? সংসার পাতলেই তো হয়!'

'ঐটি মাপ করবেন মা। আর সব পারব—ঐটি নয়, বাপ রে, সংসার পাতবার কথা মনে হ'লেই আমার হৃৎকম্প হয়।'

'তা তো বটেই।' ভেতর থেকে পুঁটির কণ্ঠস্বর বেজে ওঠে আবার, —'তা নইলে অমন জংলির মতো থাকার সুবিধে হবে কেন?'

কিন্তু পুঁটি মুখে যাই বলুক, হতভাগা লোকটার ওপর তারও দয়ামায়া হয় মাঝে মাঝে। সেদিনই দুপুরবেলা ক্ষার কাচতে দেবে ব'লে বৈঠকখানায় দাদার কাপড়-জামা নিতে এসেছিল। যেতে যেতেও অবাধ্য চোখ পড়ে সর্বেশ্বরের দিকে, বদ্ধঘরে এক-গা ঘেমে যেন ঘামের সমুদ্রে পড়ে ঘুমুচ্ছে। খানিকটা ইতস্ততঃ করল পুঁটি—একবার বেরিয়ে গেল, আবার ফিরে এসে একখানা পাখা ঠকাস ক'রে ওর গায়ের ওপরই ফেলে দিয়ে গেল।

ঘুমের ঘোরে পাখাখানা টেনে নিয়ে সর্বেশ্বর হাওয়া খেতে খেতে আবার ঘুমিয়ে পড়ল, সে টেরও পেল না—পাখাখানা কে দিয়ে গেল।

পরের দিন হাটবার। এ হাটও বেশ জমে ওঠে। তারই ফাঁকে

কেষ্টধন এসে সর্বেশ্বরকে চুপি চুপি ধরে,—'হ্যাঁ দাদা, আপনার ও মাদুলিতে মকদ্দমার কিছু হয় ?'

'হওয়া তো উচিত ভাই। গুরুদেব বলেছেন সঙ্কটমোচন মাদুলি, যে কোনও সঙ্কটেই মুক্তি পাবার কথা।'

কেষ্টধন ইতস্ততঃ ক'রে একটু গলাটা নামিয়ে বলে,—'আচ্ছা ওরই মধ্যে এমন মাদুলি নেই যে একটু বেশী কাজ করে—মানে নিঘ্‌ঘাত! ব্যাপারটা আর কিছু নয় ভাই। একটা ছেঁড়া মকদ্দমায় জেরবার হয়ে পড়লুম। কী বলব, নিজের দাদামশাইয়ের সঙ্গেই মামলা একটা জমি নিয়ে। তা সে বুড়ো এমন মামলাবাজ, আমাকে একেবারে জ্বালাতন ক'রে মারলে। এবার একটা বিশ্রী ফৌজদারিতে জড়িয়েছে। এমন সব সাক্ষীদের তালিম দিয়ে রেখেছে যে জেরায় জব্দ করাও মুশকিল। দু'বিঘে জমির জন্যে কি বুড়ো বয়সে জেল খাটব ?'

'ও এই ?' তাচ্ছিল্যের সুরেই বলে সর্বেশ্বর,—'এ আর এমন বেশী কথা কি! আছে, সে মাদুলিও আছে, পঁচিশ টাকা পুজো পড়বে। একটিই আছে—এখানে অতটাকা কে দেবে ব'লে আমি কাউকে বলি নি।'

'—পঁচিশ টাকা ?' কেষ্টধনের মুখ শুকিয়ে যায়, 'কিছু কমে হবে না দাদা ?'

'কমে তো হবার উপায় নেই ভাই। ওর জন্যে যে স্পেশ্যাল যাগ করতে হয়। তার তো খরচা আছে। এতে আমাদের কোন লাভ নেই।'

শুক্‌নো ঠোঁটের ওপর জিভটা বার-দুই বুলিয়ে নিয়ে কেষ্টধন সর্বেশ্বরের হাত দুটো চেপে ধরে, 'দাদা বারোটা টাকা কাছে আছে, মাইরি বলছি, এখন এই নাও। মামলাটা মিটে যাক—আমি ঠিক তোমার টাকা চুকিয়ে দেবো। বিশ্বাস করো।'

'তাই দাও।' উদাসীনভাবে বলে সর্বেশ্বর,—'তোমরা আমার

বন্ধুবান্ধবের মতো হয়ে গিয়েছ, তোমাদের সঙ্গে এসব কারবার করতেই আমার খারাপ লাগে।'

ট্যাঁক থেকে বারোটা টাকা বার ক'রে সর্বেশ্বরের হাতে দিচ্ছে কেষ্টধন—এমন সময় একজোড়া ধুতি বগলে ক'রে বিপ্রদাস সেখানে এসে পড়ে।

'আরে আরে এ কী কাণ্ড! কেষ্টধন যে! আরে তুমিও মাদুলি নিচ্ছ নাকি? তুমিও যে দেখছি ঢললে এদিকে—'

'না না বিপ্রদা—মানে আমি নই—' বেগুনি হয়ে ওঠে কেষ্টধনের কালো মুখখানা, 'ঐ আমার বোনাইয়ের ভাই—'

'বুঝেছি' বলে মুখ টিপে হাসে বিপ্রদাস।

কেষ্টধনের হাতে মাদুলিটা গুঁজে দিতে দিতে সর্বেশ্বর কথাটা ঘুরিয়ে দেয়,—'কাপড় কী হবে হে?

'তা জানি নে ভাই। পুঁটির হুকুম—একজোড়া কাপড় চাই।'

'তাও তো দেখছি ধুতি।'

'ধুতির কথাই তো বলে দিয়েছে।'

'নিজের কাপড়ের হিসেবটাও দেখছি রাখো না।'

অপ্রতিভভাবে হেসে বিপ্রদাস বলে,—'তা যা বলেছ! ও-ই সব করে। কিন্তু আমি তো, যতদূর মনে পড়ছে, একমাস আগেই একজোড়া কিনেছি। কী রকম হ'ল—?'

'যাকগে, হুকুম যখন তামিল করেছ—তখন আর কথা কি!'

হাট শেষ হয়ে এসেছিল। দুজনেই একসঙ্গে বাড়ির পথ ধরল। বাড়ি ফিরে বিপ্রদাস হেঁকে বললে,—'এই নে পুঁটি তোর কাপড়। সাত টাকা সাড়ে ছ আনা। ধুতির কথাই তো বলেছিলি।'

'হ্যাঁ, তুমি শাড়ি এনেছ নাকি?'

'না না, ধুতিই এনেছি। কিন্তু আমার ধুতি একজোড়া গত মাসেই কেনা হয়েছে না?'

'তোমার ধুতি কে বলেছে ?'

'তবে ?'

'বাড়িতে আর মানুষ নেই ? এক কাপড় কতদিন সাবান কেচে কেচে চলবে ? ও পুরোনো কাপড় পাঁচুকে কাচতে দিতে ব'লো দাদা, আর টাকাটা চেয়ে নিও।'

সর্বেশ্বর একেবারে আকাশ থেকে পড়ে।

'ও কাপড় কি আমার জন্যে এল নাকি ? এই মরেছে ! নতুন কাপড়ের আবার কী দরকার পড়ল ? এই তো বেশ চলছিল।'

'—হ্যাঁ। বিনা মাইনের ঝি পেয়েছ কিনা—রোজ রোজ আমি সাবান দেব।'

'—কে বলে ? কে দিতে বলে তোকে ? দিস কেন ?' সর্বেশ্বর জ্বলে ওঠে।

সে কথার জবাব দেয় না পুঁটি। শুধু বলে,—'হরিশবাবুকে বলে আর একটা জামাও করিয়ে দিও দাদা। সন্ন্যিসী হয় তো গেরুয়া নিক—সংসারে থাকতে গেলে গেরস্তের মতো চলাই উচিত।'

॥ ১৪ ॥

পরের হাট থেকে সর্বেশ্বর ফিরল প্রায় লাট্টুর মতো পাক খেতে খেতে। চিৎকার করতে করতে ঢুকল, 'ভট্‌চায্! কৈ হে ভট্‌চায্, বাড়ি ফিরছে নাকি হে ?'

বিপ্রদাস তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে, 'হ্যাঁ, এই এলাম।'

'আজ হাটে যাও নি তো !'

'না। আজ চরণকে পাঠিয়েছিলাম—কিন্তু ব্যাপারটা কি ?'

'আর ব্যাপার ! আজ হাটে গেলে একটা জিনিস দেখতে।

দারুণ কাণ্ড। মোদ্দা বলো এখন কী খাবে। তোমার দোকান থেকে এনেই তোমাকে খাওয়াবো—'

'বলি ব্যাপারটা কি?'

'ঐ যে হে, তোমার কেষ্টধন, বলি তুমিই তো দেখলে হাতে পায়ে ধরে গেল-হাটে পাঁচটাকার মাদুলিটা বারো টাকায় নিয়েছিল, তা পরের দিন ছিল ওর এক ফৌজদারি মকদ্দমা, ওর জেতবার কথা নয়, তবু জিতে গেছে। ব্যস—মাদুলিরই গুণ! বুঝলে না? কথাটা মুখে মুখে ছড়িয়ে গেছে। আজ একেবারে চারপাশের গাঁ ভেঙে লোক পড়েছে মাদুলির জন্যে। মাদুলির ব্যাগ খালি—ওষুধও যা ছিল সব শেষ। একেবারে ফরসা। ফেরার পথে আমাদের মেসের ম্যানেজার বিনয়বাবুকে টেলিগ্রাম ক'রে এলুম, টাকাও পাঠিয়েছি কিছু, এক চালান মাদুলি পার্শেল করতে। ওষুধওলাকেও তার পাঠিয়ে দিয়েছি। তোমার এখানে চালান আসবে ভি.পি. হয়ে। এখন আর নড়ছিও না সহজে, তা তুমি মনে মনে যতই গালাগাল দাও।'

বিপ্রদাস হেসে বললে, 'গালাগাল আর দেব কেন বলুন। আপনি তো আমার ঘাড়ে চেপে খাচ্ছেন না—এর মধ্যে তো একরাশ টাকা দিলেন।'

'ছাই দিলুম। কী আর দিচ্ছি। তুমি তো নিতেই চাও না।' তারপর গলাটা একটু নামিয়েই বলে সর্বেশ্বর—'তোমার বোনের জন্যে একটা ভাল দেখে কাপড় কিনব ভাব্‌ছি। বাবুলাল মাড়োয়ারীকে ব'লেও রেখেছি।'

আস্তে বললেও কথাটা কানে যায় পুঁটির, সে রান্নাঘরের দাওয়া নিকোতে নিকোতে ব'লে ওঠে, 'কেন, আমি কি ঝি? যে ঝি-বিদেয় দেবে? খবরদার দাদা, বারণ ক'রে দিও—'

সর্বেশ্বর মুখ ভ্যাঙায়, 'ইস্। তেজ ছ্যাখো না। ফোঁস ক'রেই

আছেন মেয়ে। ভট্‌চায্‌, এ বোন নিয়ে তোমার কপালে বিস্তর দুঃখু আছে তা ব'লে দিচ্ছি।'

'আছে তো আছে, সে বোনের দাদা বুঝবে। পরের অত মাথাব্যথা কেন?'

বিপ্রদাস ধমক দেয়, 'তুই থাম্‌ দিকি পুঁটি। ভেতরে যা দিকি।'

খাওয়া-দাওয়ার পর সর্বেশ্বর বিড়ি ধরিয়ে আরাম ক'রে শুয়েছে, হুঁকো হাতে ক'রে বিপ্রদাস এসে ঢুকল, 'মুখুজ্জেদা ঘুমুলে নাকি?'

'না না। এসো। ব্যাপার কি? না গড়িয়ে এ ঘরে এলে যে?'

'ঘুমটা ঠিক আসছে না। আচ্ছা মুখুজ্জেদা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'স্বচ্ছন্দে। একটা কেন, একশ'টা করো না। ভয় ছেড়ে নির্ভয়ে কও? কী কথা?'

'আচ্ছা, তোমার ও মাদুলির মধ্যে আছে কি? সত্যিই কি কোন ওষুধ-বিষুধ কি কোন মন্তর-টন্তর—?'

'ছিঃ ভট্‌চায্‌। জ্ঞানী লোক হয়ে তুমিও একথা জিজ্ঞেস করছ এতদিন পরে?···ওর মধ্যে আছে শুকনো তুলসী পাতা। আর কি থাকবে? বিবেচনা করো তুলসীর বড় আছেই বা কি? স্বয়ং নারায়ণ যা মাথায় ধারণ করেন?'

'যাই বলো—বাহাদুর ছেলে বটে তুমি!' সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে বলে বিপ্রদাস।

সর্বেশ্বর একটু কৌতুকের সুরেই বলে, 'তারপর ভট্‌চায্‌, এটা তো মনে হচ্ছে গৌরচন্দ্রিকা, আসল কথাটা কি ব'লে ফেল দেখি?'

বিপ্রদাস হুঁকোটা হাতে দিয়ে একটু কেশে গলাটা সাফ্‌ ক'রে নিয়ে বলল, 'বলছিলুম কি, এখানে তোমার ব্যবসাটা তো একরকম

জমেছে ভাল। তা এদেশ ওদেশ না ক'রে এখানেই গোড়া গেড়ে ফ্যালো না।'

'তার মানে? ব্যাপারটা কি খোলসা ক'রে বলো।'

'বলছিলুম যে চিরকাল তো আর এমন ক'রে ভেসে বেড়ালে চলবে না। তুমি এবার একটি সংসার করো।'

'সংসার? সংসার করব কিহে? বয়স কত হ'ল তার হিসেব আছে? চল্লিশের আর খুব বেশী দেরি নেই যে—'

বিপ্রদাস কণ্ঠস্বরে জোর দিয়ে বলে—'তা হোক, ও বয়সে আজকাল অনেকেই বিয়ে করছে। বলছিলুম কি, তুমি আমার বোনটিকে নিয়ে এখানেই সংসার পাতো—না না, কোন ওজর আমি শুনব না, ওকে তোমার পায়ে রাখতেই হবে।'

সর্বেশ্বর অবাক হয়ে বলে, 'য়্যাঁ, কি বলছ হে তুমি? আমাকে দেবে মেয়ে! চাল নেই, চুলো নেই, বলতে গেলে জোচ্চুরি ক'রে খাই, তার ওপর বয়সেরও সীমে-পরিসীমে নেই। বোনের আর পাত্তর পেলে না তুমি?'

'পাত্তর আর কোথায় পাচ্ছি বলো ভাই? অনেক খুঁজেছি, একে কালো মেয়ে—তার ওপর আমার পয়সা নেই। এ গাঁয়ে পাত্তর আছে এক ঐ বিড়িওলা সুরেনের ছোট ভাই। কলকাতায় কি একটা চাকরি করে, কোন্ অফিসের বুঝি বেয়ারা। পঞ্চান্নটি টাকা পায়। তাও চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু সুরেন পাঁচশ টাকা নগদ চেয়ে বসল। শুধু তো ঐ টাকাতেও হবে না—আরও তো খরচ আছে—অন্তত দুটি হাজার টাকার কম কাজটা নামবে না!'

সর্বেশ্বর ব্যাকুল হয়ে ব'লে ওঠে—'না না, তুমি অন্য পাত্তর ছাখো। ও আমি পারব না ভাই, তা হ'লে আমাকে আজই চলে যেতে হয়।'

'না না, সে কথা নয়, আমি জোর করব না। ভাল ক'রে ভেবে

ছাখো। কথাটা আমি খারাপ বলি নি।'

বিপ্রদাস বেরিয়ে গেল ঘর থেকে দোর ভেজিয়ে দিয়ে। কিন্তু সর্বেশ্বরের আর ঘুম এল না। এলোমেলো কত কি চিন্তা—সে চিন্তা এক সময় কখন পুঁটির প্রসঙ্গে এসে স্থির হয়—তা বুঝতেও পারে না। এই দেড় মাস ধরে যে নিটোল সেবা পাচ্ছে ওর কাছ থেকে—সেই কথাটাই যেন বেশী ক'রে মনে হয়। বিবাহিত জীবনও কল্পনা করে—পুত্র-কন্যা, পরিপূর্ণ সংসার, আর সেই সঙ্গে একটি মুখরা সেবা-পরায়ণা স্ত্রী। কিন্তু কিছুদিন আগে—এই কয়েক সপ্তাহ আগেও—জিনিসটা কল্পনা করতে যতটা অসহ্য লাগত, এখন আর ততটা লাগে না তো! ব্যাপার কী, এ কি হ'ল তার?

ভাবতে ভাবতে কখন বেলা গড়িয়ে গেছে, মধ্যাহ্ন অপরাহ্নে এসে পৌঁছেছে তা টেরও পায় নি সর্বেশ্বর। এমন কি পুঁটি এসে কখন পাশে চৌকির ওপর চা রেখে গেছে তাও দেখতে পায় নি সে। খানিক পরে ঝাঁটা হাতে ক'রে ঘর ঝাঁট দিতে এসে পুঁটি চমকে ওঠে। কারণ অন্যদিন এ সময় ঘরে থাকে না সর্বেশ্বর। চায়ের কাপ নিয়ে গিয়ে বাইরের দাওয়ায় বসা তার নিত্য অভ্যাস। আজ সে ঘরের মধ্যেই তেমনি বসে আছে, কতকটা স্তম্ভিত, বিমূঢ়ভাবে। প্রথম বিস্ময়টা সামলে নিতে না নিতে আরও চমক লাগে পুঁটির।

'ও কি, এখনও চা খান নি? কখন চা দিয়ে গেছি যে, ও চায়ের আর কী রইল? জুড়িয়ে জল হয়ে গেল যে। কিসের ধ্যান করছিলেন চোখ বুজে বুজে? সেই গুরুদেবটির নাকি?'

'য়্যাঁ, কী? চা? কোথায় চা?'

'যা ভেবেছি তাই। চায়ে মাছি পড়েছে। আবার তৈরি করতে হবে।'

'হ্যাঁ! আবার তৈরি করতে হবে না ছাই। দেখি দে, ভারি তো একটা মাছি, ওটা ফেলে দিয়ে খেলেই হবে।'

তার উদ্যত হাতের কাছ থেকে ত্বরিতগতিতে কাপটা সরিয়ে নেয় পুঁটি—'থাক হয়েছে। আপনার না ঘেন্না পিত্তি থাকতে পারে আমাদের আছে। মাছি পড়েছে চায়ে তবু সেই চা খেতে হবে, না? তারপর অসুখ করলে কে দেখবে শুনি?'

'মরগে যা। বললুম ভাল কথা, তা পছন্দ হ'ল না। তোকেই তো আবার করতে হবে? খাটুনিটা কার হবে? তাই শুনি?'

'ভারি খাটুনি। এক কাপ চা তৈরি করতে মরে যাব কিনা? তাই মাছি সুদ্ধ চা খাওয়াতে হবে লোককে।'

'মোদ্দা তাড়াতাড়ি ক'রে আনবি। কাজ আছে, এখনই আবার বেরুতে হবে।'

'না; আজ আর বেরুতে হবে না। চা খেয়ে নিয়ে একটু শুয়ে থাকুন দেখি চুপ ক'রে। মুখ-চোখ কেমন ধারা হয়ে উঠেছে, নিশ্চয় শরীর খারাপ বোধ হচ্ছে। তা নইলে কেউ বসে বসে ঘুমোয়?'

সর্বেশ্বর ধমক দেবার চেষ্টা করে, 'থাম, থাম, মেলা ফ্যাচ-ফ্যাচ করিস নি! তোর শাসনে আমাকে চলতে হবে নাকি?'

'হ্যাঁ, তাই হবে। কৈ যান তো দেখি কেমন যেতে পারেন! আজ বিকেলে বেরুতে পাবেন না।'

সর্বেশ্বর মুখটা গোঁজ ক'রে বলে 'ভ্যালা বিপদ হ'ল দেখছি। এখানে বাস করা আর চলল না।'

'আচ্ছা আচ্ছা, এখন দয়া ক'রে উঠে একটু মুখে-মাথায় জল দিন দিকি। হাট থেকে আসতে রোদটা বোধ হয় লেগেছে। আমি গরম চা ক'রে আনি, খেয়ে শুয়ে পড়ুন। এমন কিছু রাজ-কাজ্য নেই বাইরে যে, না গেলে ন'শো পঞ্চাশটাকা লোকসান হবে। কাজের মধ্যে তো বিড়ি খাওয়া, তা সেটা ঘরে বসে খেলেই হবে।

না হয় মেঝেটা আমি আর একবার ঝাঁট দেব।'

হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেয় সর্বেশ্বর, 'যা খুশি করগে যা। তোর সঙ্গে বকতে পারি না আমি।'

॥ ১৫ ॥

পরের দিন ভোরে উঠে সর্বেশ্বর বেরিয়ে পড়েছিল মাঠে। রাত্রেও ভাল ঘুম হয় নি, কান-মাথা জ্বালা করছে যেন। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় তাই ঘুরল অনেকক্ষণ ধরে। কথাটা যেন পেয়ে বসেছে তাকে। ভুলতেও পারছে না, ভাবতেও চাইছে না—এই তার অবস্থা। অনেকক্ষণ পর্যন্ত মাঠে মাঠে ঘুরে সবে ঘরে এসে জামাটি ছেড়েছে, পুঁটি এল এক কাঁশি মুড়ি আর বেগুনি নিয়ে।

—'সকাল থেকে কোথায় এত ঘোরেন। কখন থেকে বেগুনি ভেজে বসে আছি। সময়ের হুঁশ থাকে না?'

'সময়ের হুঁশ থাকে ঠিকই। তবে কি জানিস—'কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকায় সর্বেশ্বর পুঁটির মুখের দিকে, 'আমার জন্যে তো কেউ কোন দিন খাবার তৈরি ক'রে বসে থাকে নি কোন কালে, তাই নতুন অভ্যেসটা হ'তে একটু দেরি লাগে।'

'ঢের হয়েছে। হাত-পা ধুয়ে নিন দিকি তাড়াতাড়ি।...'

একটু পরেই আবার চা হাতে ক'রে এসে ঢোকে পুঁটি, 'ওকি, খেতেই শুরু করেন নি এখনও?'

'খাচ্ছি, খাচ্ছি। পুঁটি, একটা কথা মনে পড়ে গেল রে, তাই ভাবছিলুম।'

'কী কথা?'...উৎসুক নেত্রে চায় পুঁটি।

'তোর দাদা যে আমার সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে চায় রে।'

'ধ্যেৎ!' পুঁটি চায়ের কাপটা তখন সবে নামিয়ে রাখছিল, হাত কেঁপে চলকে খানিকটা চা পড়ে গেল।

'হ্যাঁ রে, বলছিল।'

'ও আবার কি অসভ্য ঠাট্টা! ওসব আমার ভাল লাগে না।'

'মাইরি বলছি ঠাট্টা নয়। আচ্ছা সত্যিই যদি বিয়ে হয়— আমাকে তোর পছন্দ হবে?...'

পুঁটি আগুনের মতো রাঙা হয়ে উঠেছিল। সে ঠকাস ক'রে চায়ের কাপটা বসিয়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যেতে যেতে ব'লে গেল,— 'জানি নে। অত বাজে কথা আমি বকতে পারি না।'

সর্বেশ্বর অবাক হয়ে সেদিকে চেয়ে রইল। কারণ বিরক্তি নয় লজ্জা নয়—কে যেন সুখেরই একটি অঞ্জন মাখিয়ে দিয়েছে পুঁটির নিরস কঠিন মুখে।

তাহ'লে কি পুঁটি তার মতো লোককেও—?

•

সেদিনও দুপুর বেলা হুঁকো হাতে ক'রে বিপ্রদাস এসে বসল।— 'মুখুজ্জেদা কি ঠিক করলে?'

সর্বেশ্বর অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর বললে,—'এত তাড়াতাড়ি কেন?'

বিপ্রদাস হুঁকোটা একরকম ফেলে দিয়েই ওর হাত দুটো চেপে ধরল, 'ভাই, মনটা যখন টলেছে তখন আর দেরি ক'রো না। আমি পুরুত ঠাকুরকে দিয়ে পাঁজি দেখিয়েছি, সামনের হপ্তাতেই দিন আছে।'

'না না, ভট্‌চায্‌। আর দুটো দিন যাক। কথাটা আর একটু ভেবে দেখি।' ব্যাকুলকণ্ঠে বলে সর্বেশ্বর।

'রেখে দাও দিকি ওসব ভাবাভাবি। মিছিমিছি সময় নষ্ট। পিসিমার মত নিতে হবে? তা যদি হয় ঠিকানা দাও, আমি ঘুরে আসি—'

'না না। বাপ রে, সেখানে বনমালী ঘোষাল আছে। মত লাগবে না। আমি বিয়ে করলেই পিসিমা খুশী।'

'তবে আর কি! ওই ঠিক রইল।'

'মাইরি ভট্‌চায্‌। এখনই যেন এসব কথা নিয়ে পাঁচকান ক'রো না। আর একটু…'

তার কথা শেষ করতে না দিয়েই বিপ্রদাস ব'লে উঠল, 'ক্ষেপেছ তুমি। এখন পাঁচকান করতে অছে? এমনিতেই তো ব্যাটারা হিংসেয় মরে যাচ্ছে, তার ওপর একথা শুনলে আর রক্ষে আছে?'

তবু কথাটা চাপা থাকে না। এসব কথা কী ক'রে ছড়িয়ে পড়ে—তা বোধকরি আজও কেউ জানে না। বিপ্রদাসের অনুপস্থিতিতে বিলক্ষণ ঘোঁট হয়। সুরেন বলে, 'দেখলে ব্যাপার, বিপ্রদাকে তোমরা যতটা ভালমানুষ ভাবো ততটা নয়।'

হরিশ বলে, 'ওকে চিনতে তোমাদের এখনও দেরি আছে! ও যে কত মতলবে ঘোরে! ভিতভিতে ডান—ছেলে খাবার রাক্কস। —কম দুইছে নাকি লোকটার কাছ থেকে? আজকাল হাটে গেলে বিপ্রদাস সকলের বড় মাছটা কেনে। আগে দু পয়সার পুঁটি মাছও জুটত না।'

সুরেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'যে যার দিন কিনে নিচ্ছে। শুধু আমরাই যে তিমিরে সেই তিমিরে রইলুম।'

ওদিকে মেসে একদিন বিনয়বাবু প্রদোষকে ডেকে বলেন, 'ওহে প্রদোষবাবু, শোন শোন—আমাদের মুখুজ্জের পাত্তা পাওয়া গেছে।'

'কী রকম, কী রকম?' আরও দুচার-জন ভিড় ক'রে আসে।

'এই যে, আমাকে হঠাৎ এক টি-এম-ও পাঠিয়েছে পঁচিশ-টাকার। দু গ্রোস তামার খালি মাদুলি পাঠাতে হবে এই

ঠিকানায়। সাবাস্! এত রকমও জানে বাবা। কোথায় কী আবার এক বুজরুকী কারবার ফেঁদে বসেছে।'

'আপনি কী করলেন?'

'আমার এক বন্ধু এইসব কারবার করে, তাকে দিয়ে দিয়েছি এতক্ষণ চলেও গেছে বোধহয়।'

প্রদোষ বলে, 'বিনয়বাবু, ভাই—ঠিকানাটা আমার একটু চাই যে!'

'কেন হে, কি করবে?'

'সেই ঘোষাল বুড়োকে দিতে হবে যে।'

'কি হবে? না না, দরকার নেই। মিছিমিছি, একটা কারবার ফেঁদে বসেছে, শুধু শুধু আবার সেখানে থেকেও পালাতে হবে।'

'না না, বুঝছেন না। আমি তিন সত্যি করেছি বুড়োর কাছে। আর আপনাদের বাঁচবার জন্যেই সেটা করতে হয়েছে, নইলে কি সে উঠত? আপনাদেরও কতকটা মোরাল রেস্‌পন্‌সিবিলিটি আছে।'

'তবে নাও'—অনিচ্ছাসত্ত্বেও টেলিগ্রামটা ওর হাতে দেন বিনয়বাবু।

দুপুরে খেতে বসে সর্বেশ্বর খুশী হয়ে ওঠে—'আরে, এ শুষনি শাকের ডালনা কোথা থেকে এল?'

ঘরের ভেতর থেকে পুঁটির মা উত্তর দেন—'ও মেয়ের কীর্তি বাবা। তুমি নাকি খেতে ভালবাস, তাই আজ একবেলা ধরে মণ্ডলদের পুকুর থেকে শাক তুলেছে।'

'আমি খেতে ভালবাসি সে কথা আবার কে বললে?'

'তুমি নাকি কবে খোকাকে বলেছিলে খেতে বসে,—

'ও—হ্যাঁ হ্যাঁ', বিপ্রদাস বলে ওঠে, 'সেই যে সেদিন বললে কলমীশাক খেতে খেতে…'

পুঁটি ভেতরে চাপাগলায় ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'তোমার কি কোন কাজকম্ম নেই মা ? এত বাজে কথাও বকতে পারো।'

হাঃ হাঃ ক'রে হেসে ওঠে বিপ্রদাস। কিন্তু সর্বেশ্বর কেমন যেন গুম্ হয়ে যায়। সেদিনও দুপুরে ঘুমোতে পারে না এক ফোঁটা। কত কি এলোমেলো চিন্তা মাথায় এসে মাথা গরম ক'রে দেয়।

বিকেলে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় কেষ্টধনের দোকানে গিয়েই বসে সর্বেশ্বর।

'দাও হে কেষ্টধন, এক গেলাস তোমার ঐ তেতো চা।'

'এই যে আসুন, আসুন, মুখুজ্জেদা,' কোঁচার খুট দিয়ে বেঞ্চিটা ঝেড়ে ওকে খাতির ক'রে বসতে দেয় কেষ্টধন। তখন দোকানে আর কেউ নেই। ছোট্ট মোটা কাঁচের গেলাসটিতে খানিকটা কড়া চা তৈরি ক'রে এনে ওর সামনে টেবিলের ওপর রেখে কেষ্টধনও পাশে বসে পড়ে। তারপর গলাটা নামিয়ে বলে—'সত্যি মুখুজ্জেদা, কথাটা শুনে যে কী আনন্দ হ'ল—'

সর্বেশ্বর ভ্রূটা কুঁচকে জবাব দিলে—'অমন হয়! কারুর সর্বনাশ, আর কারুর পৌষ মাস। আমাকে খ'য়ে বন্ধনে জড়াতে না পারলে বুঝি তোমাদের সুখ নেই ?'

'না, তা নয়। তা কেন বলছ ? চিরকাল কি আর একভাবে কাটে ? ক্রমশ শরীর ভেঙে আসবে। তখন মনে হবে একটু আরাম চাই। এ তো ভালই। ঘুরতে চাও, আশেপাশে ঘুরে বেড়িও। কিন্তু একটা আস্তানা তো রইল।'

সর্বেশ্বর গম্ভীরমুখে চায়ে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে বললে—'হুঁ, তা বটে।'

কেষ্টধন উৎসাহিত হয়ে বলে, 'তা শোন, আমি বলি কি বন্ধন যখন হ'লই, তখন ভাল ক'রেই সংসার পাতো দাদা। শ্বশুরের ঘরে বারোমাস থাকাটা ভাল নয়। ঐ ডাঙাটার ওপাশে একটা ঘর

তুমি নিজে তুলে নাও।'

সর্বেশ্বর অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে থেকে আবারও বলে, 'হুঁ! দেখি—'

সন্ধ্যেরও অনেক পরে সর্বেশ্বর বাসায় ফেরে। বিপ্রদাস যেন একটু উৎকণ্ঠিত হয়েই বসে ছিল বাইরের দাওয়ায়। ওকে দেখে বলে উঠল—'এই যে, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

'না—এমনি।'

'এমনি! তার মানে?'

'ওহো হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানে—এই একটু ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। আচ্ছা ভট্‌চায্, সুরেন কত টাকা চেয়েছিল তোমার কাছ থেকে? মানে ওর ভাইয়ের জন্যে—তিনশো?'

বিপ্রদাস সন্দিগ্ধ ও শঙ্কিত কণ্ঠে বললে, 'না পাঁচশো—কিন্তু সে সব কথা আবার তুলছ কেন ভাই।'

সর্বেশ্বর বললে, 'না, হঠাৎ মনে এল তাই—'

'না, না ওসব পাত্রে আর আমার দরকার নেই। পঞ্চান্নটি টাকা তো মোটে পায়। শহরবাজার জায়গা, সেখানে বাসা ক'রে থাকতে হয়। কী বা থাকে যে সংসার চালাবে।'

বিপ্রদাস চলে গেল। সর্বেশ্বর নিঃশব্দে বসে খানিকক্ষণ বিড়ি টানবার পর বেশ একটু হেঁকে ডাক দেয়, 'পুঁটি, এই পুঁটি, শোন একবার।'

পুঁটি এসে দোরের কাছ থেকেই জিজ্ঞাসা করল—'ডাকছিলেন নাকি? এত রাত্তিরে কিন্তু আর চা দেব না, তা ব'লে রাখছি।'

'না না, চা নয়। শুনে যা একবার। একটা কথা আছে।'

পুঁটি ভেতরে এসে দাঁড়াল,—'কী কথা?'

মুহূর্ত-কয়েক ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে সর্বেশ্বর বলল,—

'ত্যাখ, তোকে যা জিজ্ঞেস করব—ঠিক ঠিক জবাব দিবি? খুব জরুরী কথা কিন্তু। বল্ দিবি?'

'মিছে কথা আমি বলি নে। সে অব্যেস আমার নেই।'

'আচ্ছা—বিড়িওলা সুরেনের যে ভাইয়ের সঙ্গে তোর বিয়ের কথা হয়েছিল—তাকে তুই দেখেছিস? বল্—বল্, উত্তর দে। লজ্জা করবার কিছু নেই।'

'—দেখেছি।'

'সে আমার চেয়ে ভাল দেখতে না খারাপ দেখতে রে?'

পুঁটি এবার অস্ফুটকণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে—'জানি না, যাও—'

'সত্যি পুঁটি আমার মাথা খাস—ঠিক ক'রে বল?'

'ওসব কথা আমি বলতে পারব না। আর কিছু বলবার থাকে তো বলুন? উনুনে ভাত ফুটছে আমার।' সে চলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ায়।

'যাস নি, যাস নি পুঁটি, দাঁড়া একটু—আচ্ছা কত বয়েস হবে রে তার? তেইশ চব্বিশ?'

'ঐ রকমই হবে হয়ত—' অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে উত্তর দেয় পুঁটি।

'তার স্বভাব-চরিত্র কেমন রে?'

'লোকে তো বলে খুব ভাল ছেলে। কিন্তু আমি আর বকতে পারব না। ভাত পুড়ে গেল বোধহয়।'

'—হুঁ। আচ্ছা, যা তুই।'

॥ ১৬ ॥

পরের দিন হাটবার। নতুন মাল এসে পৌঁচেছে সর্বেশ্বরের। ভিড়ও খুব। মামলার মাদুলিরই চাহিদা বেশী। এ ছাড়া আছে

ছেলে হবার—ছেলে না হবার। এক বৃদ্ধ এসে বলে, 'দাদা ছেলের বৌটি আবার পোয়াতি হয়েছে ; ছেলে না হয়ে মেয়ে হয়, এমনি করা যায় না ? এমন কোন মাদুলি আছে নাকি ?'

সর্বেশ্বর অবাক হয়ে প্রশ্ন করে—'সে কি, ছেলেই তো ভাল। মেয়ে কী হবে ?'

মুচকি হেসে লোকটি উত্তর দেয়—'মেয়েকে একবার খরচ ক'রে পার করলেই চলে যায়। ছেলে থাকলে বিষয় ভাগ হবে। ভাগ হ'তে হ'তে শেষে কিছুই যে থাকবে না। হেই দাদা—অনেকদূর থেকে এসেছি অনেক খরচা ক'রে। একটি মাদুলি ক'রে দাও লক্ষ্মী ভাই।'

আর একজন একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন—'মামার বিষয় আমারই পাবার কথা। এতকাল তাই শুনে এসেছি। মামার ষাট পেরিয়ে যেতে নিশ্চিন্তি হয়ে এসে বসেছি চাকরিবাকরি ছেড়ে। এখন শুনছি মামীর ছেলে হবে। এর একটা ব্যবস্থা হয় না দাদা ? আমি বেশ কিছু ধরে দেবো।'

সর্বেশ্বর খানিকটা চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থেকে প্রশ্ন করে, 'মাদুলি মামীকে পরাতে পারবেন ?'

'কেন ? মানে আমি যদি পরি—কি আমার বৌ পরে ?'

'আপনি মাদুলি পরবেন—আপনার মামীর ছেলে নষ্ট হবে ?'

'সঙ্কটমোচন মাদুলি আপনার—এর চেয়ে আর কী সঙ্কট আছে বলুন ?'

'তা বটে। তাও আছে। তবে পঁচিশটি টাকা লাগবে, দেখুন। এসব অর্ডিনারি মাদুলির মারক শক্তি থাকে না।'

'পঁচিশ টাকা ! আচ্ছা দেন তাই—কিন্তু কাজ হবে তো ?'

'তা বলতে পারব না ভাই। গুরুর মাদুলি, আমি তো বাহকমাত্র।'

বিপ্রদাস ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছিল। সব শুনে বলে—'যদি

কাজ না হয় ? এরপর এসে যদি বলে বেশী দাম নিয়েছিলে, কাজ হ'ল না কেন ?'

সর্বেশ্বর প্রশান্ত মুখে উত্তর দেয়—'তখন বলব তোমার মামী কোন বেশী শক্তিশালী মাদুলি পরে ছিলেন নিশ্চয়। সে কোন ভাবনা নেই, সেদিকেও অবশ্য মাদুলি আছে। বুড়ো বয়সের ছেলে —এতদিনে কি আর চারটে মাদুলি ঝোলায় নি ওর মামী।'

দুপুর লাগাত ভিড় কমতে সুরেন এসে জেঁকে বসে ওর পাশে।

'—কী হে সুরেনচন্দর যে, কী মনে ক'রে ? কেমন আছ ?'

সুরেন মাথাটা চুলকে বলে—'তা দাদা সত্যি কথা বলব ? তোমার মাদুলিটা পরে ইস্তক দিন আমার ভালই যাচ্ছে।'

'বেশ, বেশ ! দেখি একটা বিড়ি বার করো।'

শশব্যস্তে বিড়িটা দিয়ে সুরেন বলে, 'কিন্তু দাদা—আর একটু পয়সার স্বচ্ছল না হ'লে তো চলছে না। বামুনের ছেলে, কত দিন আর বিড়ি পাকাই বলো তো ?'

'বিড়ির কারবারে আর কত আসবে বলো ? বরং লটারির টিকিট কেন, যদি কিছু আসে।'

সুরেন আরও গলা নামায়! প্রায় ফিসফিস ক'রে বলে— 'কিনেছি দাদা একটা টিকিট—দু টাকা দিয়ে। সেই জন্যেই তো তোমার কাছে আসা। তোমার গুরুদেবের এমন কোন মাদুলি নেই, যাতে ওটা নিঘ্‌ঘাৎ লেগে যায় !'

'আছে কিন্তু তার দাম কে দেবে ? সে মাদুলির দাম দিতে গেলে তোমার বিড়ির দোকান বেচতে হবে যে। তাতেও কুলোবে না।'

'—কত দাম দাদা ?' সুরেন সোৎসুকে তাকায় ওর মুখপানে।

সর্বেশ্বর একবার ওর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বললে— 'আড়াইশ'টি টাকা লাগবে। অভীষ্টসিদ্ধি মাদুলি বলে ওকে। যে-কোন অভীষ্ট ক'রে সে মাদুলি পরবে তাই সিদ্ধ হবে। কিন্তু ঐ একবারই।'

'একেবারে অতটাকা। তার কমে আর কোন জিনিস নেই?'

'উঁহু—'গম্ভীরভাবে ঘাড় দোলাতে দোলাতে বলে সর্বেশ্বর।

'একটু ছ্যাখো না দাদা ভেবেচিন্তে!'

'হবার যো নেই ভাই। ঐ জন্যেই তো বললুম তোমাকে যে, তুমি পারবে না।'

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ বসে রইল। তারপর হঠাৎ সুরেন ওর দুটি হাত চেপে ধরলে, 'দোহাই দাদা, দুশোটি টাকায় মাদুলিটি আমায় ক'রে দাও। দিতেই হবে তোমাকে।'

'সে ভাই বোধহয় পারব না।'

'দোহাই দাদা, আমার ছোটভাই এই টাকাটা পাঠিয়েছে একটা জমি কেনার জন্যে। তার এতদিনের সঞ্চয়, সেই থেকেই দিচ্ছি এখন। আর কিছু নেই।'

'দেখি গুরুদেবকে ব'লে। কিন্তু কেন একাজে যাচ্ছ ভাই? পরের টাকা ভেঙ্গে—যদি কোন ফল না হয়, তখন তো আমাকে গালাগাল দেবে।'

'সে আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। তোমাকে দোষী করব না, কথা দিচ্ছি।'

'তাহ'লে আজই গুরুদেবকে টাকাটা পাঠিয়ে একটা চিঠি লিখে দিতে হয়। ওর আবার একটা বিশেষ হোম আছে কিনা।'

'তুমি চিঠি লিখে দাও। আমি সন্ধ্যের মধ্যে নিশ্চিত তোমাকে টাকাটা পোঁছে দেব, তাহ'লেই হবে তো?'

'আচ্ছা, তাই দিও।...কিন্তু আমি এর কোন দায়িত্ব নিচ্ছি না, মনে থাকে যেন!'

সুরেন আবারও একদফা আশ্বাস দিয়ে চলে গেল। কিন্তু সর্বেশ্বর বহুক্ষণ সেখানে স্থির হয়ে বসে রইল, তার চোখে অদ্ভুত একটা দৃষ্টি।

হাট থেকে ফিরতে পুঁটি ধমক দিয়ে ওঠে –'আজ আর কি তোমাদের বাড়ি ফেরবার কথা মনে ছিল না দাদা? সুয্যি যে পাটে বসেছে। গরম জল বসিয়ে রেখেছিলুম—সে জল ফুটে ফুটে মরে গেল।'

'থাকগে, আজ আর গরম জলে দরকার নেই। আমিও ভট্‌চাযের সঙ্গে পুকুর থেকে ডুব দিয়ে আসিগে।'

'হ্যাঁ, তা আর নয়! শহরের মানুষ, অব্যেস নেই, একদিনের জন্যে পুকুরের জলে চান ক'রে জ্বরে পড়ুন আর কি। তখন দেখবে কে? কতক্ষণই বা লাগবে? তামাক খেতে খেতে আমার জল গরম হয়ে যাবে।'···

সেদিনও সারা দুপুর ঘুমোতে পারল না সর্বেশ্বর। খানিকটা ছট্‌ফট্ ক'রে তিনটে বাজবার আগেই বাইরের দাওয়ায় গিয়ে বসল। বিপ্রদাস দোকানে যাবার জন্যে বেরিয়ে ওকে ঐ অবস্থায় বসে থাকতে দেখে বললে—'কৈ, ঘুমোও নি মুখুজ্জে?'

'ঘুমটা এলো না ঠিক। তারপর—চললে?'

'হ্যাঁ—কাল মনে করেছি সকালের ট্রেনেই কলকাতা চলে যাবো। তাই কাজকর্ম সব এখন থেকে গিয়ে বুঝিয়ে দিইগে।'

'কেন, কলকাতা কেন?'

'বাঃ—বাজার-হাট চাই না? এমনিই তো মা বকাবকি করছেন। পরশু বিয়ে—কালও বাজার না করলে চলবে কেন?'

'পরশু—মানে এই পরশুই?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ। কাল বাদে পরশু। বলে, যার বিয়ে তার মনে নেই—পাড়াপড়শীর ঘুম নেই!' হেসে বিপ্রদাস চলে যায়।

সর্বেশ্বরের যেন বিড়িও ভাল লাগে না। ঘর-বার করে সে।

পুঁটি চা এনে চৌকির উপর রেখে যাচ্ছিল, হঠাৎ সর্বেশ্বর ওর পথ আগলে দাঁড়াল।

'দাঁড়া একটু, কথা আছে।'

পুঁটি অবাক হয়ে তাকাল, রাঙাও হয়ে উঠল একটু।

'আচ্ছা, আমি মানুষটা কেমন রে?'

'ও আবার কি কথা? মানুষ মানুষের মতোই। হাত চোখ কান নাক সবই তো আছে দেখছি।' পুঁটি মুখ টিপে হাসে একটু।

'আচ্ছা, আমাকে তোর ঘেন্না করে না। ঠিক ক'রে বল্ পুঁটি। তুই তো মিছে কথা বলিস না।'

'কী হয়েছে আজ আপনার বলুন তো? মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?'

'না রে। মাথা খারাপ নয়। আচ্ছা পুঁটি, তোর সঙ্গে তো আমার বিয়ে হচ্ছে। আমি তো এই মানুষ—নোংরা, জঙ্‌লি, বুজরুক! আমাকে তোর ঘেন্না করবে না? ঠিক ক'রে বল্—'

'কত কথাই জানেন আপনি। সরুন—মা ডাকছেন।'

পুঁটি একরকম ওকে ঠেলেই বেরিয়ে যায়।

সর্বেশ্বর হতাশ হয়ে এসে চৌকিতে বসে।

পরের দিন অন্ধকার থাকতে থাকতে সর্বেশ্বর উঠে পড়ে। বিপ্রদাস তখনও ঘুমোচ্ছে। পুঁটির মা ঘাটে গেছেন। পুঁটি সবে উঠে উঠোনে ছড়া দিচ্ছে। সর্বেশ্বরের সারারাত ঘুম হয় নি। দুই চোখ লাল। উদ্‌ভ্রান্তের মতো চেহারা। সর্বেশ্বর ইশারা ক'রে ওকে ডাকল—'এই পুঁটি শোন। এদিকে একবার শুনে যা।'

পুঁটি ছড়ার হাঁড়িটা নামিয়ে রেখে কাছে আসে।—'এত ভোরে আজ উঠেছেন যে। এ কী, জামাটামা গায়ে দিয়ে চললেন কোথায়? দাদা তো এখনও ঘুমুচ্ছে।'

'—তা ঘুমুক। শোন তুই। যা বলছি মাথা ঠাণ্ডা ক'রে শুনে রাখ। এই নে ধর—এই কাগজের মোড়কটাতে পাঁচশ টাকার নোট

আছে। দাদা উঠলে তাকে দিয়ে বলবি যে আমি এটা দিয়ে গেছি—তোর বিয়ের যৌতুক। সুরেনের ভাইয়ের সঙ্গেই যেন তোর বিয়ে দেয়।'

পুঁটির মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে। সে কোনমতে ঢোঁক গিলে বলে—'ওকি? এসব কি—তুমি···?'

'আমি চললুম।'

'চললে কি? আমি দাদাকে ডাকি—।'

'চুপ চুপ। তোর পায়ে ধরছি পুঁটি, গোল করিস নি। ভেবে ছাখ, আমার সঙ্গে বিয়ে হ'লে তোর দুর্গতির শেষ থাকবে না। তোর ভালর জন্যেই আমি চলে যাচ্ছি। তোর কাছে যে সেবা আর যত্ন পেয়েছি এ দুমাস—জীবনে কখনও তা পাই নি। এ কথা আমার মরণকাল পর্যন্ত মনে থাকবে। তার বদলে তোর এমন সর্বনাশ আমি করতে পারব না।'

'—সর্বনাশ?' কোনমতে পুঁটির কণ্ঠ ভেদ ক'রে প্রশ্নটা বেরিয়ে আসে।

'তা নয়তো কি। এই তো চেহারা আমার, বয়সের গাছপাথর নেই। তাছাড়া সংসারে আমি কোনদিন আটকে থাকতে পারব না। কোন দিন মন হবে—কোথায় চলে যাবো। শেষকালে তোকে দিনরাত চোখের জলে ভাসতে হবে। তার চেয়ে আমি চললুম—ভট্‌চায্‌কে বুঝিয়ে বলিস, ঐ সুরেনের ভাইয়ের সঙ্গেই যেন সব ঠিক করে—।'

সর্বেশ্বর ছুটেই বেরিয়ে যাচ্ছিল। পুঁটি পেছন থেকে ডাকল—'শোন শোন। একটু দাঁড়িয়ে যাও।'

সর্বেশ্বর ফিরে দাঁড়ায়—'কী আবার?'

'এই টাকাটা। নিয়ে যাও। এতে আমাদের দরকার নেই।'

'তার মানে?'

'আমরা কি ভিখিরী, যে ভিক্ষে দিয়ে যাচ্ছ? আমাকে তোমার পছন্দ হয় নি, আমাকে নিয়ে ঘর করতে ঘেন্না করবে—কথাটা স্পষ্ট ক'রে বললেই তো পারতে! নিয়ে যাও তোমার টাকা—আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।'

সর্বেশ্বর বিমূঢ় দৃষ্টিতে খানিকটা চেয়ে রইল ওর দিকে—'এই ত্যাখ্! এ সব কথা আবার তোর মাথায় ঢুকল কী ক'রে? আমি তো তোর ভালর জন্যেই···মানে অল্পবয়সী সুন্দর বর হবে, সেই জন্যেই তো—'

'চাইনে আমার ভাল। আমার ভাল কে ভাবতে বলছে?'

সর্বেশ্বরের চোখমুখে ফুটে ওঠে অকৃত্রিম বিস্ময়—'হ্যাঁরে, তা হ'লে কি তুই আমাকেই—? সত্যি ক'রে বল্ দিকি।'

'জানি না যাও।' পুঁটির কণ্ঠস্বর কেঁপে ওঠে বার বার, 'অত ন্যাকামি আমার ভাল লাগে না। যেতে হয় যাও, দাদাকে ডেকে দিচ্ছি, যা বলতে হয় তাকেই ব'লে যাও। মোদ্দা টাকা দিয়ে আমাকে ভোলাতে যেও না, ঐ টাকায় আমি তা হ'লে তোমার সামনেই আগুন ধরিয়ে দেবো।'

সর্বেশ্বর ধপাস ক'রে দাওয়ার সিঁড়িটার ওপর বসে পড়ল।

'তাই তো, এ আবার কী ফ্যাসাদ। এ যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে···'

বিপ্রদাস চোখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল, 'কৈ রে আমাকে ডেকে দিস্ নি? ত্যাখ্ দিকি, ভোরের গাড়ির সময় হয়ে এল। একি মুখুজ্জে, এরি মধ্যে উঠে পড়লে?'

'—উঠে আর পড়লুম কৈ ভাই। নেমেই পড়লুম। গভীর গাড্ডা।'

'কী হ'ল কি? কি বলছ?'

'আর কি বলছি। কঠিন মায়া ভাই। ভীম জাল। নাও, যাও কলকাতায়, আর কি। দেখি পুঁটি, তামাক দে।' তারপর গলাটা

নামিয়ে পুঁটিকে বলে, 'মোদ্দা আমি আমার দায়ে খালাস। আমাকে যেন এরপর দোষ দিস নি।'

বিপ্রদাস জামা কাপড় পরে বেরোতে যাবে, তার হাতে তুশোটা টাকা দিয়ে সর্বেশ্বর বললে, 'এই টাকাটা ভট্‌চায্‌ আমার নাম ক'রে সুরেনকে দেবে।'

'কেন বলো তো? এটাকা—মানে—'

'মানে পরে বুঝবে। ওকে বলো যে গুরুদেব স্বপ্নে আমাকে আদেশ করেছেন টাকাটা ওকে ফিরিয়ে দিতে। ওর অর্থপ্রাপ্তি যোগ এখনও আসে নি।'

॥ ১৭ ॥

প্রদোষের চিঠি পেঁাছেছিল কিছু বিলম্বে।

বনমালী ঘোষাল বাড়ি ছিলেন না। মেয়ের জন্যে পাত্রের খোঁজেই গিয়েছিলেন গোয়াড়ী। সেখানে সুবিধা হয় নি, মেয়ে তাদের অপছন্দ না হ'লেও পাড়ায় খোঁজখবর ক'রে পেছিয়ে গেছে তারা। স্পষ্টই ব'লে দিয়েছে যে, 'ওর চেয়ে ডোমপাড়া থেকে মেয়ে আনলেই তো হয়। মেয়ে আর মেয়ের মার গলায় শুনেছি পাড়ায় কাক-চিল বসে না! জেনেশুনে ও মেয়ে আমরা ঘরে আনতে পারব না ঘোষাল মশায়!'

সুতরাং ঘোষালের মেজাজ খারাপ। তার ওপর বাড়িতে ঢুকতেই গৃহিনী খর্‌ খর্‌ ক'রে উঠলেন, 'যেখানে যাবে বাঘের মাসী। বাড়িতে আর ঢুকতে ইচ্ছে করে না, না? চিঠিখানা এসে তুদিন ধরে পড়ে আছে—কোন ব্যবস্থাই করা হচ্ছে না। নাও, এখুনি একবার যাও দিকি ওর পিসির কাছে!'

বোমার মতো ফেটে পড়েন সর্বেশ্বর।

'আমি পারব না। পারব না। যা খুশী কর্‌গে যা!···লজ্জা করে না মুখ নাড়তে! এমন সুনাম যে এখান থেকে গঙ্গা পেরিয়ে সেই গোয়াড়ী পর্যন্ত তার বাস ছড়িয়েছে! তোমার ও খাণ্ডারণী মেয়েকে কেউ বে করবে না!··কেন, এত পারো—নিজে যেতে পারো নি সেখানে?'

'হ্যাঁ, সেইটে বাকী আছে। বেশ তো, তাও যাবো। কিন্তু তুমি বেঁচে থাকতে আমি এ কাজে বেরোলে লোকে বলবে কি? তুমি আগে গলায় দড়ি দাও, তোমাকে খালে ভাসাই তারপর আমি বেরিয়ে মেয়ের বে দিতে পারি কি না দেখি!' চীৎকার ক'রে হাত পা নেড়ে বাড়ি মাথায় করেন তিনি।

অগত্যা বনমালী ঘোষালকেই শেষ পর্যন্ত বেরোতে হয়।

তবে এবার তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সর্বেশ্বরের পিসিমাকে না নিয়ে তিনি যাবেন না। সেখানেও একদিন দেরি হ'ল। পিসি ঘর-দোরের একটা ব্যবস্থা না ক'রে তো আর বেরোতে পারেন না। ফলে ওঁরা যেদিন রওনা দিলেন সেই দিনই এখানে সর্বেশ্বরের বিয়ে।

বিয়েটা কিছুতেই এড়ানো গেল না, বসে বসে দেখতেই হ'ল সর্বেশ্বরকে, কেমন ধীরে ধীরে তার চার পাশ ঘিরে পুরুভুজের বাহুপাশের মতো সংসারের বাঁধন চেপে বসছে।

যতক্ষণ ভবিতব্যের সঙ্গে লড়াই করেছিল, যতক্ষণ আশা ছিল মুক্তি পাবার, ততক্ষণ একরকম—কিন্তু হার মানার আর হাল ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনটা আশ্চর্য রকম শান্ত হয়ে গেল। একটা স্বস্তির ও আরামের ভাবই বোধ হ'ল। এবং আরও কিছু পরে লক্ষ্য করল যে—এই উদ্যোগ আয়োজন, এদের এই ব্যস্ততা ভালই লাগছে তার। শুধু ভাল লাগা নয়—আসন্ন বিবাহের পাত্রী বা কনে তার সামনে

আর আসতে পারছে না—তবু অলক্ষ্যে থেকেও যে তার প্রতিটি প্রয়োজন ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর রাখছে—এটা অনুভব ক'রে ভারী একটা আশ্বাসও যেন বোধ করল। বুঝল যে, আসল বন্ধনটা আরামেরই—বহুদিনের তৃষার্ত পথিক স্বচ্ছ শীতল সরোবরের সন্ধান পেয়েছে, সেখান থেকে আর নড়তে চাইছে না তার মন।···

অবশ্যম্ভাবীকে মেনে নেবার সঙ্গে সঙ্গে সে সক্রিয় হয়ে উঠল। তার বশম্বদ কেষ্টধনকে ডেকে চিঠি লিখে পাঠাল তার প্রাক্তন মেসে, বিনয়বাবু যেন ভাল একখানা বেনারসী ও দুগাছা বালা কিনে আর সবাইকে নিয়ে বৌভাতের দিন এখানে আসেন, এসে পৌঁছলেই সে টাকা দিয়ে দেবে। এখানে চরণকে ডেকে সে বৌভাতের বাজার করার ফর্দ ও খরচা বুঝিয়ে দিল। সেই সঙ্গে পিসিমাকেও একটা 'তার' করে দিল—যদি পারেন তো কাউকে যেন সঙ্গে নিয়ে চলে আসেন।···

উদ্যোগ আয়োজন শেষ—বিয়ে শুরু হয়ে গেছে, মন্ত্র পড়া চলছে, সর্বেশ্বরের হাতের ওপর পুঁটির হাত—এমন সময় হুড়মুড় ক'রে পিসিমাকে নিয়ে উঠোনে এসে ঢুকলেন বনমালী ঘোষাল।

স্টেশনে নেমে বিপ্রদাসের বাড়ি জিজ্ঞাসা করতেই তাঁকে একজন বলেছিল, 'তেনার যে আজ বোনের বে। ঐ মুখুজ্জের সঙ্গে।'

বনমালী সে কথায় কান দেন নি, বরং ভ্রূকুটি ক'রে বলেছেন 'উঁঃ! মুখুজ্জের সঙ্গে তেনার বোনের বে! ওসব চালাকি তো চলবে না বাবা, আমার উচ্ছুগ্যু করা জিনিস। আমি আগে আশীর্বাদ করেছি। দেখি কে তাকে ধরে কার বোনের সঙ্গে বে দেয়! চলে আসুন গো বেয়ান ঠাকরুন।'

কিন্তু এখানে এসে এই দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়াতে হ'ল একটু।

'এ, হে হে! মেরে দিলে—ঝুল কেটে বেরিয়ে গেলে বাবা,

সত্যি সত্যিই ?'

তারপর সামনে এসে পুঁটির দিকে তাকিয়ে দেখে বললেন, 'তা আমার তো যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন, বলি মেয়েকে পার করতে পারি কিন্তু মেয়ের মাকে তো আর পারব না। আমার দুঃখ ঘোচায় কে! মোদ্দা তুমি হয়ত জিতেই গেলে শেষ পর্যন্ত। এ মেয়ে আমার মেয়ের মতো জাঁহাবাজ হয় তো দাঁড়াবে না। মরুক গে যাক—বাবাজী, অনেক দুঃখ দিয়েছ, পয়সাকড়িও নেহাত কম খরচ হয় নি। মেয়েটার যদি পাত্তর মেলে তো খরচাপত্তর্ কিছু দিও।'

বরাসন থেকেই ঘাড় হেলিয়ে সর্বেশ্বর রাজী হয়ে গেল।

॥ শেষ ॥

এই লেখকের

কলকাতার কাছেই
উপকণ্ঠে
পৌষ-ফাগুনের পালা
রাত্রির তপস্যা
বহ্নিবন্যা
মনে ছিল আশা
রজনীগন্ধা
স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্
নারী ও নিয়তি
নবজন্ম
সোহাগপুরা
পুরুষ ও রমণী
যোগাযোগ
জ্যোতিষী
মালাচন্দন
কেতকীবন
নববধূ
মিলনান্ত
জীবন আরো বড
বাহির বিশ্ব
স্বপ্ন-সন্ধ্যা
ভাড়াটে বাড়ী
স্মরণীয় দিন
জীবনস্বপ্ন
প্রভাত-সূর্য
প্রেরণা
ত্রুটি
আব্ছায়া
সমারোহ
রাত্রির সীমানা
সীমান্তরেখা
রক্তকমল
কোলাহল
চাঁদমালা
শ্রেষ্ঠ গল্প
নীলকণ্ঠী
গল্প-পঞ্চাশৎ
দেহ দেউল
আকাশলিপি
রূপতরঙ্গিমা
সুপ্তিসাগর
জন্মেছি এই দেশে